আনন্দমেলা

২৬ অগস্ট ১৯৮১ • আনন্দবাজার-প্রকাশন • ২.

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

দাঁতের পুরোপুরি যত্ন নেবার জন্যে
কোলগেট ট্রাইগার্ড টুথব্রাশ ব্যবহার করুন...
এটি দাঁতকে তিন ভাবে সুরক্ষা করে

1 দাঁতের এনামেল সুরক্ষা করে।
2 দাঁতে কোনও ময়লা জমতে দেয় না।
3 মাড়ির সুরক্ষা করে।

DC.G.74 BN

৯ ভাদ্র ১৩৮৮ • ২৬ অগস্ট ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১০ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

আইসক্রীম। সুভদ্রা-উর্মিলা মজুমদার ৪
বামনগাছ বনসাই। কমলেন্দু সরকার ২৮

গল্প

ভুমোদাদু। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১০
জ্যাক। আরতি দাস ৩৬
সুন্দরবনের হারুদা। স্নেহময় সিংহরায় ৫৩

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ১৬

উপন্যাস

সিসের আঙটি। বিমল কর ২১
হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫৭

ছড়া

সোনা আর সোমা। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৯
পাহাড়ি। বাসুদেব দেব ২৭
শুভঙ্কর। কবিরুল ইসলাম ২৭
তেমাথা। রেবন্ত গোস্বামী ৫১

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল। পি. কে. ৪৯

চিত্রকাহিনী ও কমিকস

রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২, টারজান ৬০
গাবলু ৬১, ৬৪, বাঘা ৬৫

খেলাধুলো

শতবর্ষ আগে। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪২
ফুটবলে ব্রাজিল। শ্যামসুন্দর ঘোষ ৪৪
সিডনি থেকে লীডস। মণীশ মৌলিক ৪৭

লেখাপড়া

বাংলা বলো। বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৪৩

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, তোমাদের পাতা ৩৯
ছবির মজা ৫৫, আঁকো-শেখো ৬৬
প্রসূনের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

প্রচ্ছদ : অলক মিত্র

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়

সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান

যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই

কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া, এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত!

কোল্ডরিন

সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

CASBC-64-192 BN

আইসক্রীম

সুভদ্রা-ঊর্মিলা মজুমদার

আইসক্রীম কী করে তৈরি হয়? যে মানুষটি চাকা-লাগানো গাড়ি ঠেলে আইসক্রীম ফেরি করে বেড়ায়, কোত্থেকে আসে তার আইসক্রীম? গাড়ির মধ্যে কি আইসক্রীম-পাখি ডিম পাড়ে? নাকি সেই ছড়ার কথাই সত্যি? হিমের দেশে গরুদের নিয়ে গেলেই বদলে পাওয়া যায় আইসক্রীম। আইসক্রীমের আদিকাণ্ড জানতে হলে অনেক পেছনে ফিরে যেতে হবে আমাদের।

প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। রোমের রাজা নিরো এক সন্ধ্যায় নিজের মনে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ঠাণ্ডা খেতে ইচ্ছে হল। দাসদাসীরা ছুটল পাহাড়ে। আনল বরফ। সেই বরফের সঙ্গে মধু আর ফলের কুচি মিশিয়ে দেওয়া হল রাজাকে। সেই বোধহয় পৃথিবীর প্রথম আইসক্রীম। তারপর অনেক দিন

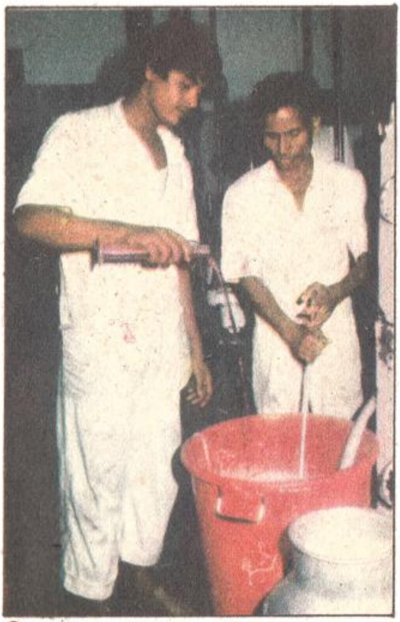

মিশেলে রঙ আর গন্ধ মেশানো হচ্ছে

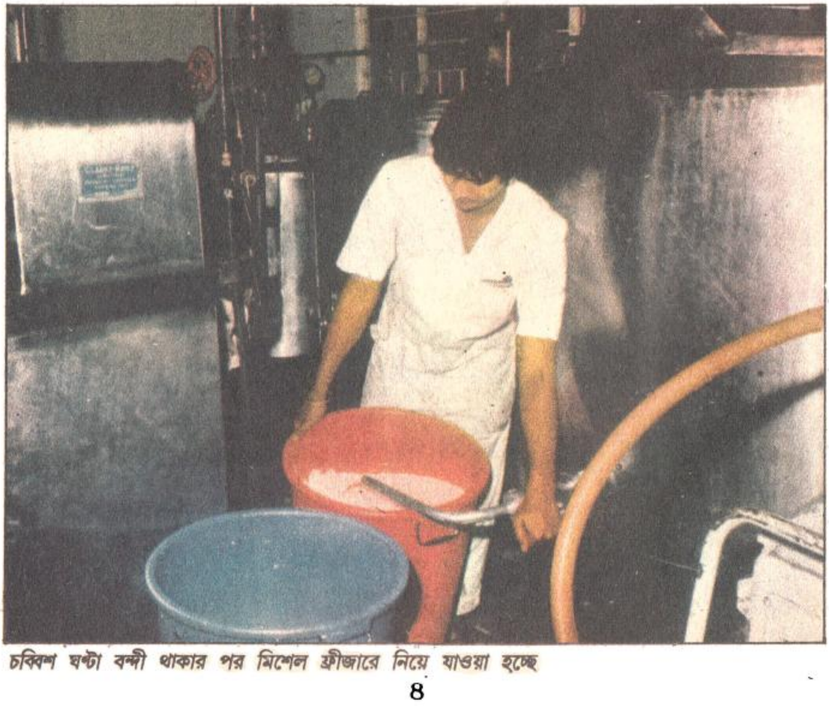

চব্বিশ ঘন্টা বন্দী থাকার পর মিশেল ফ্রীজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

রঙ-মেশানো ঘন আর ভারী মিশেল

আর আইসক্রীমের কোনো খবর নেই। কাটল আরও তেরোশো বছর। জাহাজে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে দূর-প্রাচ্যে এসে মার্কোপোলো খেলেন সুগন্ধি বরফ। সেই বরফ তাঁর এতই ভাল লাগল যে, ইতালিতে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সুগন্ধি বরফ তৈরির ফরমুলা। ১৫০০ সালের মধ্যেই আইসক্রীমের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের অন্যান্য দেশে। তখন রাজা-রাজড়ার যুগ। আইসক্রীম প্রথমেই ঢুকল রাজা-মহারাজার রান্নাঘরে। শুরু হল আইসক্রীম নিয়ে নানা পরীক্ষা। বরফের সঙ্গে শুধু মধু আর ফল নয়, মাখন আর ক্রীমও মেশানো হল। নাম হল ক্রীম-আইস। ধীরে ধীরে ক্রীম-আইস নাম পালটে হয়ে গেল আইসক্রীম। আরও বেশি লোক আইসক্রীম খেতে শুরু করল। ইউরোপে তো বটেই আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকাতেও পৌঁছে গেল আইসক্রীম।

১৮৪৬ সালের আগে পর্যন্ত আইসক্রীম তৈরি করা বেশ কঠিন ছিল। প্রথমে মস্ত এক পাত্রের মধ্যে সমস্ত মালমসলা ভর্তি করা হত।

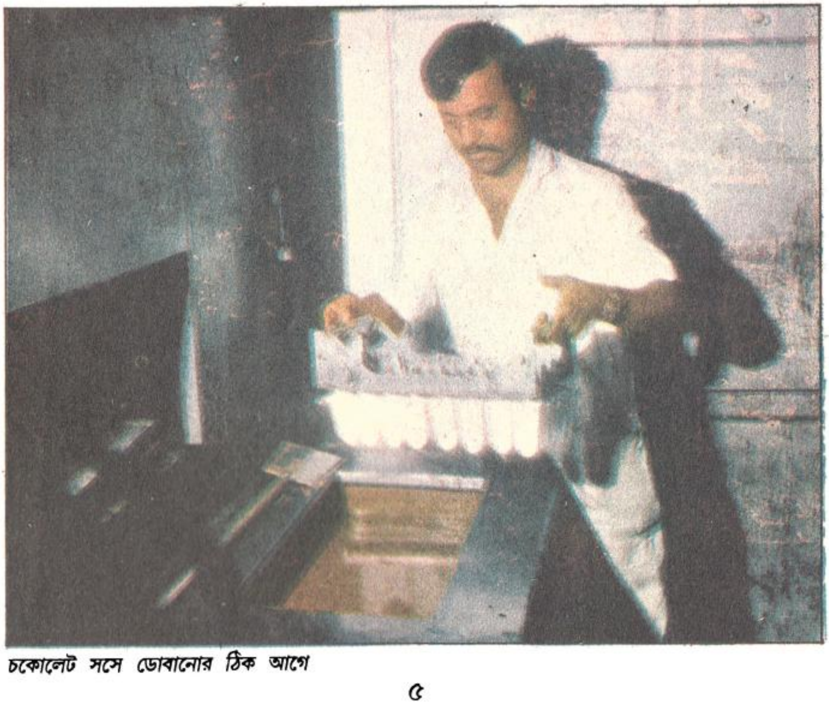

চকোলেট সসে ডোবানোর ঠিক আগে

গুহার মধ্যে গুপ্ত ছিল
চোরাই মোহর হাজার কিলো।
আলি বলেন, হায়রে হায়,
মানুষ কি আর মোহর খায় ?
সোনার মোহর ঘোড়ার ডিম
জলদি লে আও আইসক্রীম।

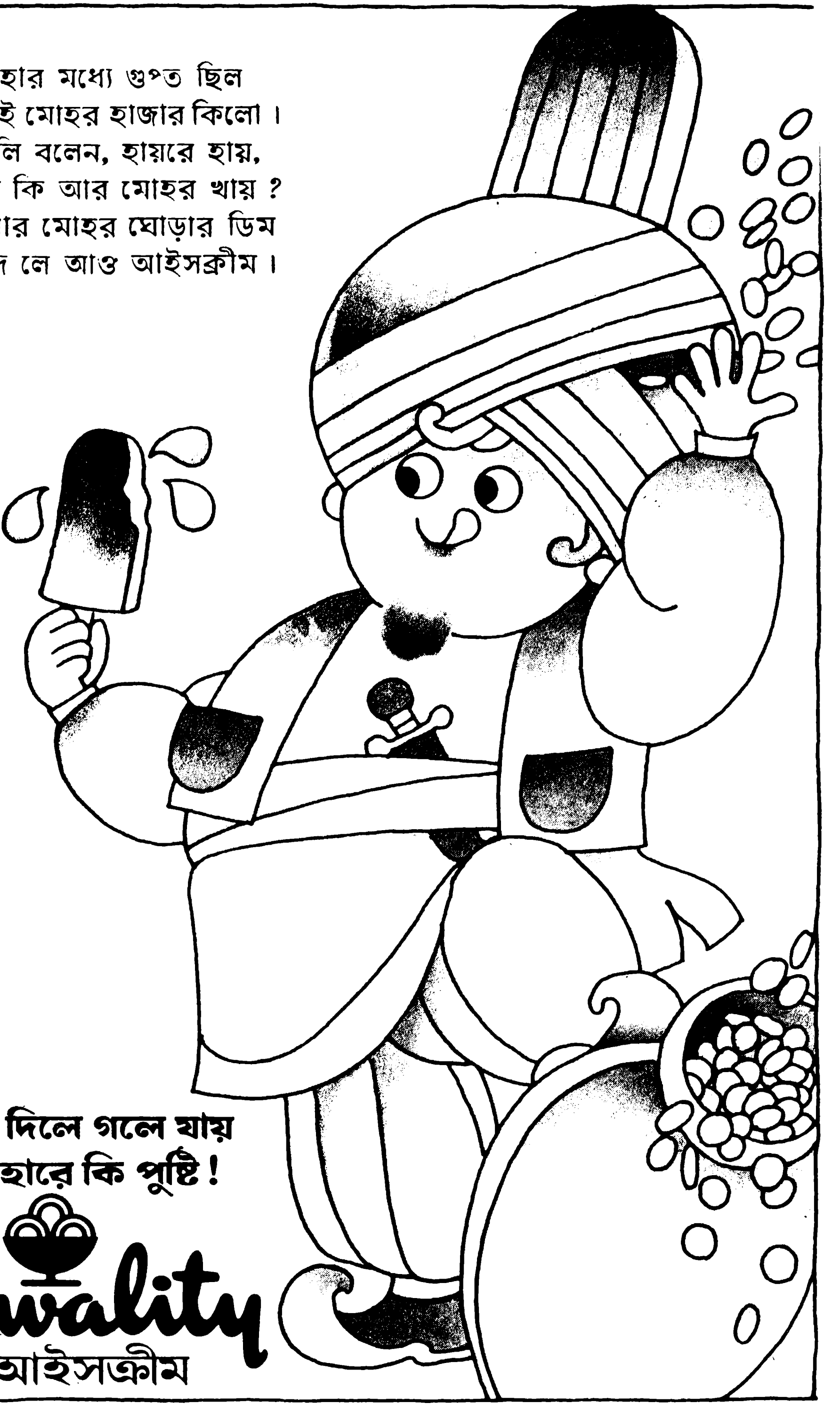

**মুখে দিলে গলে যায়
আহারে কি পুষ্টি !**

Kwality
আইসক্রীম

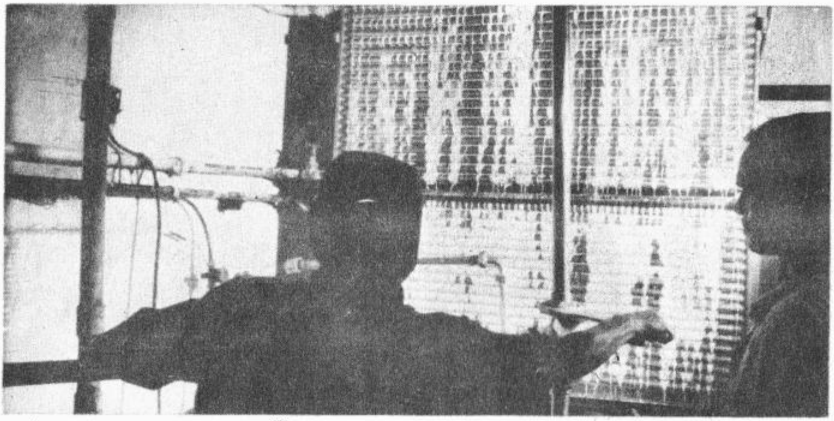

কুলারের গা বেয়ে পড়ছে তরল মিশেল

তারপর সেই পাত্রকে খুব ঝাঁকিয়ে নুন-মেশানো বরফের মধ্যে ডবিয়ে ঠাণ্ডা করা হত। ১৮৪৬ সালে তৈরি হল ফ্রীজার, অর্থাৎ ঠাণ্ডা করার যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে আইসক্রীম তৈরি করা অনেক সহজ হয়ে গেল।

কিন্তু যত দিন যায় ততই সবার মনে হতে লাগল, শুধু বাড়িতে কেন, আইসক্রীম যদি যখন-তখন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়! আর হলও তাই। আরও বেশি আইসক্রীম তৈরির জন্যে একদিন চালু হল আইসক্রীমের কারখানা। মস্ত-মস্ত মেশিন বসল কারখানায়।

তবে শুধু মেশিন হলেই তো আর আইসক্রীম হয় না। আইসক্রীম তৈরির জন্যে চাই অন্য জিনিসও। যেমন—মাখন, চিনি, দুধ, ক্রীম ইত্যাদি। এ-ছাড়া দরকার কিছু রাসায়নিক উপাদান—যেমন, এমালসিফায়ার স্টেবিলাইজারেরও দরকার, এটি ব্যবহার হয় আইসক্রীম ঘন আর মসৃণ করার জন্য।

কারখানায় আইসক্রীম তৈরির সময় প্রথমে সব উপাদান হিসেব মতো মিশিয়ে নেওয়া হয়। তারপর আধ ঘণ্টা ধরে আনুমানিক ৭০ সেন্টিগ্রেডে এই মিশেল গরম করা হয়। জালার মতো দেখতে প্রকাণ্ড সেই ধাতুর পাত্রের মধ্যে উঁকি দিলে মনে হবে, দুধ গরম করা হচ্ছে।

ফ্রীজার থেকে বেরিয়ে আসছে আইসক্রীম

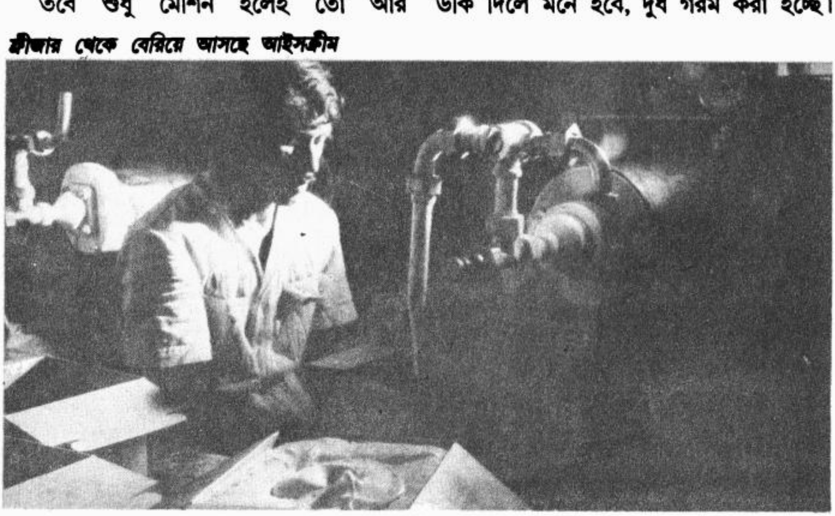

চকোলেট সস লাগানোর পরের মুহূর্ত

এইভাবে গরম করার ফলে রোগ-জীবাণু মরে যায়, মিশেল হয় পাস্তুরিত। মিশেল ঠিক মতো পাস্তুরিত হয়েছে কি না—পরীক্ষা হয় কারখানার ল্যাবরেটরিতে। কোথাও কোনো ভুল থাকলে মিশেলের সবটাই ফেলে দেওয়া হয়।

পাস্তুরিত হবার পরে মিশেলকে হোমোজিনাইজ করা হয়। অর্থাৎ, আইসক্রীমে সব উপাদান সমান অনুপাতে মেশাবার আয়োজন হয়। পাইপের ভেতর দিয়ে পাস্তুরাইজারের বড় পাত্র থেকে মিশেল গিয়ে পৌঁছয় হোমোজিনাইজারে। বড় গোছের পাম্পের মতো দেখতে এই মেশিনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় মিশেলের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩০০০পাউণ্ডের চাপ পড়ে,এবং মিশেলে সমতা আসে। মাখনের সঙ্গে দুধ-চিনি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মিশেল বেশ গরম, দেখতে দুধেরই মতো। আইসক্রীমের কোনো লক্ষণই তাতে দেখা যায় না।

কিন্তু আইসক্রীম যখন, ঠাণ্ডা তো হবেই। হোমোজিনাইজার থেকে মিশেল যেখানে যায় তার নাম কুলার। কুলারের গা বেয়ে মিশেল পৌঁছয় আর একটা মস্ত পাত্রে। এখানে মিশেলকে শুধু ঠাণ্ডাই করা হয় না, তার ঘনত্বও বাড়ানো হয়। একটানা চব্বিশ ঘণ্টা বন্দী থাকার পরে মিশেল যখন বেশ ভারী আর ঘন হয় তখন মেশানো হয় রঙ আর গন্ধ। এবার সাদা মিশেল চেহারা পালটে গোলাপি, চকোলেট, হলুদ বা কমলা রঙের ক্ষীরের মতো হয়। আর তা থেকে বার হয় স্ট্রবেরি, কমলালেবু, আম বা চকোলেটের গন্ধ।

রঙ আর গন্ধ সাধারণত কারখানার ভেতরের ল্যাবরেটরিতেই তৈরি হয়। রঙ আর গন্ধের পরিমাণ ঠিক হয়েছে কিনা দেখার জন্য রঙিন ও সুগন্ধি মিশেলের কিছুটা নিয়ে যাওয়া হয় ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য।

এর পরে জমানোর পালা। গামলা থেকে মিশেল যায় ফ্রীজারের মধ্যে। ফ্রীজারের মধ্যে তাপমাত্রা—২০ থেকে ১২ সেন্টিগ্রেড। বরফের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা। এই ফ্রীজারের মধ্যে যাওয়ার সময় মিশেলের চেহারা একেবারে পালটে যায়। ফ্রীজারের পাইপ থেকে বেরিয়ে আসে তা আমাদের খুবই চেনা ও প্রিয় আইসক্রীম। মিনিটে-মিনিটে ভরে যায় কাপ আর কার্টন।

এখনও কিন্তু কাজ একটু বাকি। কাপে আর কার্টনে ভরা আইসক্রীম এবার গিয়ে পৌঁছয় ঠাণ্ডা ঘরে। ঠাণ্ডা ঘরের তাপমাত্রায় আইসক্রীম ভাল থাকে অনেক দিন।

কাঠি-লাগানো আইসক্রীমের মিশেল ফ্রীজারের মধ্যে না গিয়ে ছাঁচের মধ্যে যায়। চৌকো-চৌকো ছাঁচের বাক্স যায় নুন-মেশানো জলের মস্ত পাত্রে। জলের তাপমাত্রা এত কমানো থাকে যে, পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে ছাঁচের মিশেল জমে আইসক্রীম হয়ে যায়। এবার প্রতিটি ছাঁচের মধ্যে কাঠি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আইসক্রীম আরও জমাট হয়ে গেলে ছাঁচ থেকে বার করে চকোলেট বা র‍্যাম্পবেরির সস্ মেশানো হয়। তারপর আইসক্রীম যায় হার্ডনিঙ চেম্বারে। শক্ত হয়ে গেলে কাগজের মোড়কে ভরা হয় আইসক্রীম। তারপর আইসক্রীম চলে যায় ঘরে।

তারপর কী হয় বলো তো? তারপরেরটা সবারই জানা। ঠাণ্ডা ঘর থেকে আইসক্রীম চলে যায় দোকানে-দোকানে অথবা চাকা-লাগানো গাড়িতে। তারপর? আহ্!

ফোটো অলক মিত্র

সোনা আর সোমা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সোনা হল বড় বোন
ছোট হল সোমা,
সোমা যা-ই করে,সোনা
বলে ওঠে, "ওমা!"

সোনা যদি বলে "যাই",
সোমা বলে,"তা-তা",
দিদিকে এগিয়ে দেয়
লালনীল ছাতা।

বড়জন চুপচাপ
গান গায়; পড়ে,
ছোটজন সর্দার—
দাপাদাপি করে।

একদিন হুলো এসে
'ম্যাও' বলে কেঁদে
সোমাকে জানাল, "তুমি
রেখে দাও বেঁধে।"

সোনা বলে, "কক্ষনো
বিল্লিকে ঘরে
বেঁধে-টেঁধে রাখব না,
বাবা যদি ধরে!"

সোমা যত করে ফোঁস
সোনা তত রাগে,
'ম্যাও' বলে হাঁক দিয়ে
বিল্লিও ভাগে।

ছবি দেবাশিস দেব

ভুমোদাদু

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুমোদাদুর আসল নামটা যে কী, আমরা প্রায় সবাই ভুলে গেছি। বোধহয় ভূমেন সেন বা ঐ জাতীয় কিছু একটা নাম ছিল। এখন উনি সবার দ্রষ্টব্য ব্যাপার। সব সময় তালে তালে পা ফেলে চলেন। প্রথমে বাঁ, তারপর ডান, তারপর আবার বাঁ। পরনে শীত গ্রীষ্ম সব সময় খাকি প্যান্ট আর খাকি শার্ট। প্যান্টে ছ'টা পকেট। পাশে দুটো, পেছনে দুটো, আর হাঁটুর ওপর দুটো। শার্টে চারটে। বুকে দুটো, আর হাতে দুটো। এইসব পকেটে পাওয়া যায় না এমন জিনিস নেই। পেন্সিল-কাটা ছুরি, বোতল খোলার যন্ত্র, কাঁচি, কাটার যন্ত্র, ব্যাণ্ডেজ, ডেটল, আইডিন, সব পাবে। কখন কোনটা কী দরকার লাগে কে জানে! একমাথা পাকা চুল নিয়ে ওই পোশাকে তিনি যখন 'ঘাস বিচালি ঘাস' বলতে বলতে হাত দুটোকে তালে তালে উঠিয়ে নামিয়ে চলেন, তখন পাড়ার বাচালতম কুকুরটাও ডাকতে ভুলে যায়। পাড়ার খুদের দল কিন্তু খুব মজা করে। ওরাও বেরিয়ে এসে ওঁর পেছনে দল বেঁধে সারিবদ্ধ হয়ে 'ঘাস বিচালি ঘাস' বলতে বলতে চলে। সে এক মজার ব্যাপার। উনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধরতে পারেন না। তারপর যখন বুঝতে পারেন, তখন তেড়ে গাল পাড়েন। বলেন, পড়াশুনোয় তো অষ্টরম্ভা, শুধু হনুমানিতে ডক্টরেট করছ। শরীর চর্চার নাম নেই, সারাক্ষণ ফুটবল পিটছ। ডন দিতে জানো? বৈঠক কাকে বলে শিখেছ? যত সব বাঁদরের দল।

ছেলেরা পালায়।

ভুমোদাদু সবার দাদু। আমরাও বলি, বাবারাও বলেন। ভুমোদাদু সারাক্ষণ ওঁদের নিজেদের সময়কার কথা, ওঁদের গ্রামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উচ্চকণ্ঠে বলেন। এই তো শামু সেদিন ওর জামাইবাবু খাবে বলে কয়েকটা গলদা চিংড়ি আনছিল বাজার থেকে। পড়ে গেল ভুমোদাদুর সামনে। "কী কিনেছ? গলদা? কলকাতায় এইগুলো বুঝি গলদা বলে চলে! এগুলো খাবার কোনো মানেই হয় না।

ব্রহ্মপুত্রের গলদা দেখেছ? একটা গলদার মুড়োর ঘিয়ে একথালা ভাত হলুদ হয়ে যেত. এমনি ঘিলু। কলকাতায় আবার গলদা হয়? ছোঃ।" গলদা সম্বন্ধে যে মত, কইয়ের সম্বন্ধেও সেই মত। চ্যাটালো কই মাছ তো আমরা দেখলামই না। কলকাতার কলা অখাদ্য। ওঁরা যে চাটিম কলা খেয়েছেন বা সবরি কলা খেয়েছেন, তার তুলনায় এগুলো চাঁদের কাছে বাঁদরের তুল্য। ইত্যাদি ইত্যাদি।

খাওয়ার সম্বন্ধে উনি যা বলতেন, তাতে আমাদের মজাই লাগত। কিন্তু উনি যখন আমাদের নিয়ে পড়তেন, তখন বেশ রাগ হত। আমাদের দেখে নাকি ওঁর কাঁদতেও ইচ্ছে করে না। উনি বলতেন, "ভাগ্যিস দক্ষিণাদা নেই। থাকলে তিনি তোদের দেখে আত্মঘাতী হতেন নিশ্চয়। তোদের মতো অকালকুষ্মাণ্ডের জন্যই কি আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে লড়েছিলাম?"

ভুমোদাদু স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিলেন। লোকে বলে উনি কিছুদিন আন্দামানের সেলুলার জেলেও কাটিয়ে এসেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জন্য যে ভাতা আছে. তার জন্য উনি কোনো আবেদন করবেন না। ওঁর বক্তব্য, "আমরা কি রাইটার্স বিলডিংয়ে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করে স্বদেশী-আন্দোলনে নেমেছিলাম যে, আজ পেনশনের জন্যে অ্যাপ্লাই করব! কাগজপত্তর যা দরকার, ওদের তো আছেই, দরকার হয় ওরাই দেখে নিক। আমি **উপযাচক** হতে পারব না।"

এই রকম সব ওঁর ধারণা। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মুণ্ডপাত শুরু হত। আমরা অকর্মা, আমাদের দিয়ে দেশের কিচ্ছু কাজ হবে না। আমরা শুধু ফুটবল ক্রিকেটের মাঠে গিয়ে হল্লাই করতে পারি। এইসব কথা ওঁর মুখে সর্বদা লেগে আছে। এসব আমাদের একদম শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ওঁর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। উনি তাহলে আরও জোরের সঙ্গে কথাগুলি বলবেন। আমরা তাই ওঁর কথা না-শোনার চেষ্টা করতাম।

উনি ওঁর পাগলামি চালিয়েই যেতে লাগলেন। ইদানীং উনি হাঁটার সময় মোটর গাড়ি-চালকের মতো সঙ্কেত দিতে শুরু করেছেন। ডান দিকে বাঁক নেবার সময় ডান হাত লম্বা করে দিয়ে হাত ঝাঁকান। বাঁদিকের বেলা বাঁ হাত। থামতে হলে হাত খাড়া করে

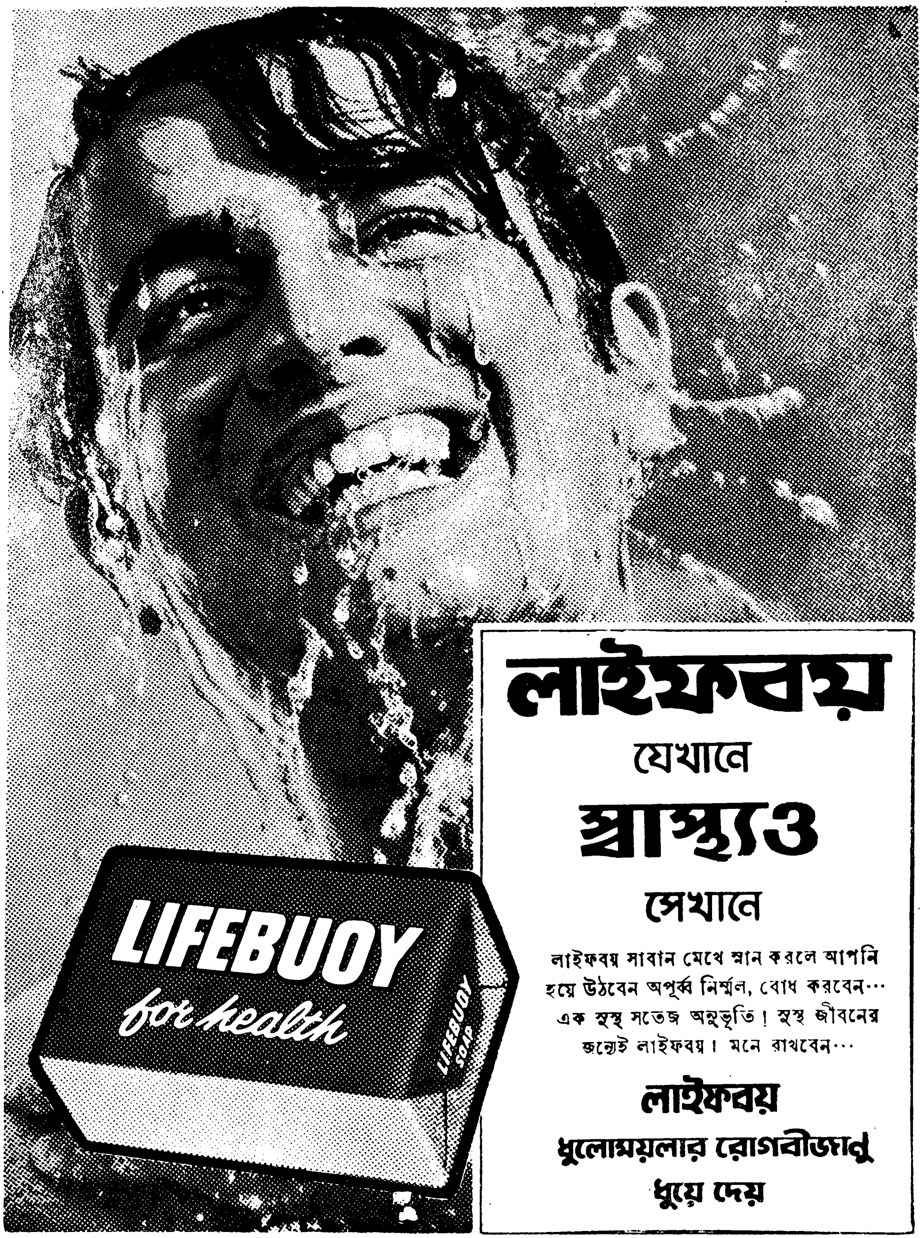

লিনটাস-L. 75-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

দাঁড়িয়ে যান। ওঁর কথা, রাস্তায় এত বেশি লোক চলে যে, সংকেত না-দিলে একে অন্যের ঘাড়ে এসে পড়বে। লোকে হাঁ করে ওর কাজকর্ম দেখে। উনি নির্বিকার। ওইভাবে উনি সারা কলকাতা হেঁটে বেড়ান। হাঁটেন কেন, জিজ্ঞেস করলে বলেন, উনি টিকটিকি নন, সুতরাং বাসের গায়ে লেপটে থাকতে পারেন না, আর একমাত্র ওইভাবে ছাড়া বাসে চড়া অসম্ভব। আর যেহেতু উনি নবাব খাঞ্জা খাঁয়ের বংশধর নন, সেহেতু ট্যাক্সি চড়াও ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত হেঁটে বেড়ান। চেনাশোনা লোকজনের খবর নেন। ভুমোদাদুকে দেখলেই লোকজনে প্রমাদ গোনে। উনি একটানা কথা বলে যান। যে-কোনো বিষয়ে একদমে নিজস্ব মতামত দেন এক ঘণ্টা। তারপর দম নিতে থামেন। খোঁজ করেন শ্রোতা কী ভাবছে। মতদ্বৈধ দেখলে খুশি হন। কেননা, সেক্ষেত্রে আরো দু ঘণ্টা ধরে ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে বলবার সুযোগ মেলে। যদি একমত হন, তাহলেও রক্ষা নেই। শুধু শুধু 'হ্যাঁ' বললেই হল নাকি ? কেন 'হ্যাঁ' বলছ, সেটা আমায় বোঝাও তো। বাড়িতে পড়াশোনা করা ছেলেমেয়ে থাকলে প্রথমেই খবর নেবেন সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠে। ভোর চারটার পর বিছানায় থাকা আলস্যের লক্ষণ। তখন উঠে পড়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে, কিছু ভেজানো ছোলা, আদা আর গুড় খেয়ে একশো ডন-বৈঠক দিয়ে পড়তে বসে যায় কিনা। বলেন, "বিদ্যার্থীদের একদম আলস্য থাকা উচিত নয়।"

সেই যেবার প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কলকাতা ভেসে গিয়েছিল, সেবার ভুমোদাদু খুব খুশি ছিলেন। কোথা থেকে একটা বিরাট গামলা যোগাড় করে একটা লাঠি দিয়ে লগি বানিয়ে গামলা-নৌকায় সবার বাড়ি বাড়ি তত্ত্বতালাশ নিতে থাকলেন। বললেন, "আমাদের দেশে তো শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে যেতেও নৌকা লাগত। এ জল তো তেমন জল নয়।" সেবার সেই বৃষ্টির মধ্যে বিশুর বাবার খুব জ্বর হয়েছিল। উনি বিশুর বাবার জন্য ডাক্তার ওষুধপত্র সব যোগাড় করেছিলেন। শুধু বিশু সম্বন্ধে কিছু অবজ্ঞাসূচক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। বিশুর মতো ছেলেকে নাকি দক্ষিণাদা চিমটে দিয়ে ছুঁলেও স্নান করতেন।

দক্ষিণাদা হচ্ছেন ভুমোদাদুর আদর্শ ব্যক্তি। দক্ষিণাদা গ্রামে একটা কুস্তির আখড়া চালাতেন। সেখানকার ছেলেদের শরীর হত লোহার। প্যাকাটিও না, থলথলেও না। তারা ঘুষি মেরে নারকেল ফাটাত। গ্রামে আগুন লাগলে আগুন নেবাত, মড়কের সময় প্রাণপণ রোগীর সেবা করত, বন্যার সময় বন্যাত্রাণে নামত, আর অন্য সময় দেশ স্বাধীন করবার চেষ্টা করত দক্ষিণাদা নিজে লাঠি খেলতেন, সাঁড়াশির মতো শক্ত করে হাত ধরলে সে-হাত ছাড়ানোর সাধ্য কারো ছিল না, আর দু'হাতেই তাঁর রিভলভারের নিশানা ছিল অব্যর্থ। দক্ষিণাদাকে যখন পুলিশ ধরে, তখন তাঁর প্রায় প্রতিটি হাড় চুর চুর করে দিয়েও পুলিশ একটাও কথা তাঁর কাছ থেকে বার করতে পারে নি। পরে পুলিশ-হাসপাতালেই উনি মারা যান। ওঁর দলের ছেলেরা সবাই আন্দামান-ফেরত। ইংরাজ সরকার দক্ষিণাদার শিষ্যদের বিলক্ষণ সমীহ করত। এসব কথা বলতে বলতে ভুমোদাদুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মনে মনে উনি সেইসব দিনে ফিরে যেতেন। শামু বিশু আর আমার এসব একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হত। আমরা স্বাধীন দেশে জন্মেছি। যদি না-জন্মাতাম, তাহলে আমরাও দেশের স্বাধীনতার জন্য নিশ্চয় চেষ্টা করতাম। যে-জিনিস করবার আমাদের কোনো উপায়ই নেই, সে-জিনিস না করবার জন্য অবজ্ঞা করার কোনো যুক্তি আছে বলে আমাদের মনে হত না।

তারপর একদিন সেই ঘটনাটা ঘটল। আমরা আর ভুমোদাদু বন্ধু হয়ে গেলাম। দলবল মিলে আমরা পিকনিক করতে গিয়েছিলাম কোলাঘাট। রূপনারায়ণ নদের তীরে ভারী একটা সুন্দর জায়গা খুঁজে বার করেছিল বিশু। শীতের মিঠেকড়া রোদে নদীর ধারে আমাদের পিকনিক দারুণ জমেছিল। খিচুড়ি রেঁধেছিল শামু। বিশু আর আমি উনুন ধরিয়েছিলাম, মশলাপাতি যোগাড় করেছিলাম, কলাপাতা কেটে এনেছিলাম আর বাড়ি থেকে না-বলে-নিয়ে-আসা আচার দিয়ে অনেকটা খিচুড়ি খেয়েছিলাম। তারপর সবাই মিলে নৌকো চড়ে রূপনারায়ণের বুকে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।

এবার নিন! প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

বুস্ট

মল্ট চকোলেট মিল্ক ড্রিঙ্ক

একটি ট্রেনের ইঞ্জিনের যেমন, আপনারও তাই—দিনটাকে ঠিকমতো শুরু করতে দরকার অফুরন্ত শক্তি। তাই রোজ সকালে আপনার চাই বুস্ট।

এই শক্তির রসদ আপনাকে সারাদিন তরতাজা, আর চূড়ান্ত গতিমান করে রাখে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের, দৌড়ঝাঁপে যাদের শক্তি ক্ষয় হয় সবচেয়ে বেশী।

ওদের বুস্ট খেতে দিন। বুস্ট, মল্ট, কোকো আর দুধ থেকে তৈরী। পুষ্টির ব্যাপারে যারা সবথেকে ভাল বোঝেন সেই বিখ্যাত হরলিক্‌স নির্মাতাদেরই তৈরী-বুস্ট!

ঘন সুস্বাদু বুস্ট বেশী শক্তি যোগাতে অতুলনীয়, কারণ তা তৈরী হয় পুষ্টিকর ক্রীমযুক্ত দুধ, গম, মল্ট বার্লি আর কোকো থেকে।

আপনার ছেলেমেয়েকে সুস্থ-সবল করে গড়ে তুলতে বুস্টে রয়েছে অধিক সংখ্যক পুষ্টিকর উপাদান।

আর তা'ছাড়া বুস্টের স্বাদ! সারা পরিবারের জিভে-জল-আসা ঘন মল্ট চকোলেটের মজা! বুস্ট।

দিন শুরু করার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রতিদিন।

Boost 'হরলিক্‌স' নির্মাতাদের তৈরী

৫০০ গ্রাম-এর সাশ্রয়কারী রিফিল প্যাকেও পাওয়া যায়। এইটি কিনে ১ টাকা বাঁচান।

HTD-HMM-6820

শীতকালে অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নেমে আসে। তাই যদিও আমরা ছ'টার ট্রেনটা ধরলাম, তবু চারিদিক তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের ট্রেনটায় মাঝামাঝি ধরনের ভিড় ছিল। আমাদের হাঁড়িকুড়ি সব রেখে যখন সবে গুছিয়ে বসেছি, তখন দেখি অন্যদিকের বেঞ্চিতে বসে ভুমোদাদু একজন লোককে কী বোঝাচ্ছেন। আমাদের দেখে বললেন, কোথায় গিয়েছিলে? 'পিকনিক' শুনে বললেন, "অ, বনভোজন। তা ভাল। মাঝে মাঝে একটু-আধটু বাইরে বেড়িয়ে পড়লে মনটা তরতাজা থাকে।" বলেই পাশের লোকটিকে আবার কী যেন বোঝাতে শুরু করলেন। ভদ্রলোকের নিরুপায় মুখ দেখে আমাদের খুব হাসি পেল। বেচারা জানে না যে, ভুমোদাদুর বক্তৃতা এখন হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত চলবে।

এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে এসেছি। অন্ধকারে আমাদের ট্রেনটা একটা ছোট্ট স্টেশনে এসে দাঁড়াল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, শীত করছে বেশ। আমাদের কামরায় উঠল চারটে ছেলে। এ-রকম ছেলে আমরা আগে দেখেছি অনেক। একটু রুক্ষ, উদ্ধত আর বেপরোয়া। গাড়ি ছাড়তে বোঝা গেল, তার চাইতে একটু বেশি এলেমদার। হঠাৎ ফটাফট ওরা চাকু বের করে ফেলল। তারপর ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে লম্বা আর জোয়ান, সে বলল, "যার যা টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি আছে সব দিয়ে দাও, আর চেঁচিয়েছ কি সোজা বুকের মধ্যে চাকু সেঁদিয়ে দেব।"

আমার কাছে ক' পয়সা আছে মনে মনে গুনতে থাকলাম। ভাবতে লাগলাম, এখনই বের করে ফেলব কি না।

হঠাৎ শুনি ভুমোদাদুর গলা। "তোমরা কী বলছ, আরেকবার বলবে?"

ফিরে দেখি ভুমোদাদু উঠে দাঁড়িয়েছেন। এগিয়ে আসছেন।

ছেলেগুলো অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, "বুড়োটাকে একটু নেড়ে দ্যাখ।"

সেই ঢ্যাঙা ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ছুরি ওঠাল। কিন্তু ছুরিটা নামার আগেই ভুমোদাদু কী একটা কায়দায় যেন ছুরিসুদ্ধ হাতটা ধরে ফেললেন. আর বললেন, "দক্ষিণাদার তোমাকে অত সহজে ছুরি মারা যায় না।"

ছেলেটার হাতটা ধরে সেইভাবেই জোরে একটা টিপুনি দিলেন। দক্ষিণাদার সাঁড়াশি-হাত আমরা দেখি নি। কিন্তু এখন স্বচক্ষে দেখলাম ওই জোয়ান গুণ্ডাটার হাত থেকে ছুরিটা খসে পড়ল, আর লোকটা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। দলের অন্যরা এবার ভুমোদাদুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল।

শামুকে আমরা এতক্ষণ লক্ষ করি নি। আমাদের ফুটবল-টীমের বাঘা লিংকম্যান। কতবার ওকে কাটিয়ে নিয়ে যাবার সময় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে বিশুদ্ধ কাঁচি খেয়ে শুয়ে পড়তে দেখেছি। তবে এর আগে দু'জনকে একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখি নি। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল গোল হয়ে যাবে। আমি কীভাবে জানি না লাফ দিয়ে উঠে ওই পড়ে-যাওয়া লোকগুলোর দুটো হাত আমার দুই পা দিয়ে চেপে ধরলাম। ওরা নড়তে পারছিল না। আমি প্রাণপণে চেপে ধরেছিলাম। শামু আর বিশু তখন চতুর্থ জনকে নিয়ে পড়েছে। বিশুর দক্ষিণাদা ছিল না। কিন্তু বিশুর ঘুসিকে সবাই সমীহ করে। এখন ওই গুণ্ডাটা বুঝতে পারছিল, কেন করে।

এতক্ষণে সকলের হুঁশ হয়েছে। অন্যরাও এগিয়ে এসেছে। অবিশ্রান্ত কিল ঘুসি লাথি পড়ছে ওই চার জনের ওপর। এরই মধ্যে গাড়ি থামল। কিছু লোক নেমে খুব চেঁচামেচি করল। আরও জড় হল। পুলিশ এল। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি, ভুমোদাদু তখনও ছেলেটার হাত ছাড়েন নি। পুলিশ আসতে ছেড়ে দিলেন। ওই জোয়ান লোকটা বুড়ো পাকাচুলওয়ালা লোকটার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল।

পুলিশের হাঙ্গামা-টাঙ্গামা মিটিয়ে বাড়ি ফিরতে একটু রাত হল। ভুমোদাদু সারা পথ চুপ করে ছিলেন। আমরাও কথা বলছিলাম না। বাড়ির কাছে এসে ভুমোদাদু মুখ খুললেন। "না রে, ভুলই করেছি। এখন মনে হচ্ছে, তোদের দেখলে দক্ষিণাদা খুশিই হতেন।"

আমাদের বুকের মধ্যে কেমন করছিল। আমরা ওঁকে প্রণাম করে বাড়ি চলে গেলাম।

তারপর থেকে, ওই যে একটু আগে বললাম, আমরা আর ভুমোদাদু বেশ বন্ধু হয়ে গেছি।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৩৩ ॥

১৯৪০ সালটা ছিল নানা দিক দিয়ে বেশ গোলমেলে বছর। বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর রাজনৈতিক জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটল যে, বসুবাড়ির সকলের উপরেই কোনো-না-কোনো ভাবে তার প্রভাব পড়ল। আগের বছরে কংগ্রেসের নেতারা 'শৃঙ্খলা' ভাঙবার দায়ে রাঙাকাকাবাবুকে দল থেকে প্রায় বের করে দিয়েছিলেন। তখন বাবা বাংলার বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলের নেতা। ক্রমে ক্রমে বাবার সঙ্গেও কংগ্রেসের উপরতলার নেতাদের মতভেদ ও তিক্ততা বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪০-এর শেষের দিকে বাবাকেও কংগ্রেস হাই কমাণ্ড 'শৃঙ্খলা' ভাঙার অভিযোগে দলনেতার পদ থেকে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু দিলে হবে কী, দলের অধিকাংশ সদস্যই বাবার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে কংগ্রেস দল হিসাবেই কাজ চালিয়ে গেলেন। যেমন বাংলার প্রদেশ কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য রাঙাকাকাবাবুর নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যাই হোক, ভাগাভাগির ফলে বাইরে যেমন, বিধান-সভাতেও তেমন দুটি কংগ্রেস দল হয়ে গেল। অন্যটির নেতা হলেন কিরণশঙ্কর রায়।

কিরণবাবু ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বহুদিনের হৃদ্যতা। আমরা ছেলেবেলায় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে তাঁদের অনেক দেখেছি। তিরিশের দশকের প্রথমে যখন রাঙাকাকাবাবু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, তখন কিরণশঙ্কর ছিলেন সেক্রেটারি। কিরণবাবুর চেহারায় বেশ একটা আভিজাত্যের ছাপ ছিল। ওপর থেকে তাঁকে গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলেও তিনি খুব রসিক ও হৃদয়বান লোক ছিলেন। শুনেছি তাঁর তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধির জন্য অনেকে তাঁকে বোস 'গ্রুপের চাণক্য বলে অভিহিত করতেন। শেষের দিকে রাজনীতির ডামাডোলে অন্য দলে চলে গেলেও বাবার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ক দেখে অনেকে অবাক হতেন। কিরণবাবুর অকালমৃত্যুর কিছুদিন আগেও রোগে শয্যাশায়ী পুরনো বন্ধুকে বাবা নানা কাজের মধ্যেও দেখতে যেতেন এবং ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরতেন।

বিধানসভায় বাবার দুজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে উডবার্ন পার্কে প্রায়ই দেখতে পেতাম। একজন তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, অন্যজন সন্তোষকুমার বসু। তুলসীবাবুর মতো সুপুরুষ বড় একটা দেখিনি, তবে তাঁর সম্বন্ধে যেটা বেশি মনে পড়ে, সেটা হল তাঁর শিষ্টাচার। তাঁর ব্যবহারে ও কথাবার্তায় শিক্ষা ও ভদ্রতার যে পরিচয় পাওয়া যেত, তার তুলনা নেই। হয়তো বাবার জরুরি কোনো চিঠি নিয়ে আমি তাঁর বাড়িতে গেছি, তিনি নিজে বেরিয়ে এসে দরজার গোড়ায় পরদা তুলে ধরে সবিনয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ না আমি ঢুকছি। ভাবটা হল যে, এই যুবকটি তাঁর বাড়িতে পদার্পণ করে তাঁকে কৃতার্থ করেছে। তুলসীবাবু হয়তো আমাদের বাড়িতে এসেছেন, বাবার হয়ে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করতে নেমেছি এবং তাঁরই কায়দায় পরদা তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। তা কিন্তু হবে না, তিনি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েই আছেন, আমি এগুলে তিনি এগুবেন। তাঁর বক্তৃতার ক্ষমতার কথা তো বলাই বাহুল্য। রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করে তাঁর একটা বক্তৃতা বিধানসভায় শুনেছিলাম, আজও কানে বাজে।

সন্তোষকুমার বসু আমাদের সকলের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও খুব ভাল বক্তা ছিলেন, আর তাঁর গলার জোর ছিল খুব। ১৯৩৭-এ রাঙাকাকাবাবুর অভ্যর্থনা-সভায় মাইক খারাপ হয়ে যায়। ডাক পড়ল সন্তোষবাবুর। তিনি শুধু-গলায় সকলকে

forced feeding. Nobody has any moral right to fe[illegible] me by force. This point was thrashed out with the British Cabinet in the case of Terence Macswiney and at a later period with the Government of India during our hungerstrike of 1926. Any circulars or Jail Code provisions which may have come into existence since then will not have any binding effect on me.

I repeat that this letter, written on the sacred day of Kali Pujah, should not be treated as a threat or ultimatum. It is merely an affirmation of one's faith, written in all humility. Hence it should be handled as a confidential document to be communicated to Government confidentially. I only desire that Government should know how my mind has been working so that they may appreciate my motives as well as the consequences, for me, of their decision.

Thanking you for your uniform courtesy,

Yours faithfully,
[illegible]

[illegible]sidency Jail,
[illegible]lcutta
30.10.[illegible]

Forwarded to [illegible] Home Dept for information [illegible]

ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর কাজে যথাসাধ্য সহায়তা করে গেছেন। তাঁর কাছে লেখা রাঙাকাকাবাবুর অনেকগুলো চিঠি তিনি নেতাজি-ভবনের সংগ্রহশালায় দান করে গেছেন।

স্কুলজীবনে আমরা আমাদের জ্যাঠাবাবু সতীশচন্দ্র বসুকে দেখতাম কম। কারণ তিনি পাটনায় ব্যারিস্টারি করতেন। তিরিশের দশকের শেষের দিকে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং এখানকার হাইকোর্টে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে আমরা তাঁকে প্রায় রোজই দেখতে পেতাম। উডবার্ন পার্কের দক্ষিণের বারান্দায় বাবার টেবিলের পাশে আর-একটি টেবিলে তিনি প্রায়ই এসে বসতেন। তন্ন-তন্ন করে খবরের কাগজ পড়া তাঁর একটা অভ্যাস ছিল, কোথায় কী হচ্ছে, সবকিছু তাঁর নখের ডগায় থাকত। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব জমত। প্রায় প্রত্যেককেই তিনি বেশ মজার-মজার নাম দিতেন আর ক্রমাগতই ছড়া কাটতেন। ছোটখাটো ফুটফুটে একটি মেয়ের নাম দিলেন 'বাঘ', বেশ বড়সড় একটি ছেলের নাম দিলেন 'ইঁদুর', ইত্যাদি। আমাদের বাড়িতে মেয়েদের 'বুড়ি' বা তার কাছাকাছি নাম দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এদের বয়স দুশো, তিনশো না চারশো, এই নিয়ে ছোটদের সঙ্গে সরস ও সরব আলোচনা চালাতেন। বন্ধুবান্ধবরাও বাদ যেতেন না। যেমন, কোনো একজনের নাম ছিল অবনী, তার নাম দিলেন লর্ড অ্যালব্যানি।

১৯২১ সালে রাঙাকাকাবাবু যখন কেমব্রিজে বসে আই. সি. এস থেকে ইস্তফা দিলেন, জ্যাঠাবাবু তখন বিলেতে ছিলেন। জ্যাঠাবাবুকে ইংরেজ-কর্তারা ধরেছিলেন রাঙাকাকাবাবুকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে মত বদলাবার চেষ্টা করতে। তিরিশের দশকের শেষে কলকাতায় ফেরবার পর রাঙাকাকাবাবুর ইচ্ছায় জ্যাঠাবাবু করপোরেশনের কাউন্সিলর হয়েছিলেন। পরে বিধানসভারও সভ্য হন।

যুদ্ধের সময় বসু-বাড়িতে পরপর কয়েকটি মৃত্যু হয়। বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। জ্যাঠাবাবু এক নিদারুণ শোক পেয়েছিলেন। তাঁর বড় ছেলে ধীরেন্দ্রনাথ—যাঁকে সকলেই

যাদের বয়স ১৬ বছরের কম……

কলকাতা আমাদের সকলের প্রিয়। এই শহরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আমাদের গর্বের। তাই এই শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা, তাকে আরো সুন্দর করে তোলার দায়িত্বও আমাদের। তোমরা ভাবতে পারো তোমরা তো ছেলেমানুষ, তোমাদের দায়িত্ব আবার কোথায়—সামর্থ্যই বা কতটুকু! কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়, কাজেই সামর্থ্য তোমাদের নিশ্চয়ই আছে। আর দায়িত্বের কথা যদি বলো তাহলে বলি তোমরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ, কাজেই এখন থেকেই একটু একটু দায়িত্ব নিতে হবে বৈ কি।

এবারে দেখো কী ভাবে তোমরা শহরকে সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করতে পারো। যেমন ধরো রাস্তার গাছ—প্রত্যেকে যদি একটা দুটো করে গাছ লাগাও তাহলে কয়েক বছরেই কলকাতার চেহারা পালটে যাবে। আবার দেখো জঞ্জালের কথা। যেখানে-সেখানে, যখন-তখন জঞ্জাল না ফেলে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় যদি জঞ্জাল ফেলা যায়, তাহলে শহরের একটু শ্রীবৃদ্ধি হয় বৈ কি।

কাজগুলি খুব কঠিন মনে হচ্ছে কি? এবারে একটা প্রতিযোগিতার কথা বলছি। কলকাতা শহর সম্বন্ধে ছোটরা কী ভাবছে তার উপরে কিছু লিখে আমাদের পাঠাও। সবচেয়ে ভালো যারা লিখবে তাদের মধ্যে ১৫০ টাকার পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রতিযোগীদের বয়স কিন্তু ১৬ বছরের কম হওয়া চাই। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ তারিখের মধ্যে নিচের ঠিকানায় লেখা পাঠাবে।

একটা কথা মনে রেখো। লেখাটি যেন তিন শ' শব্দের বেশী না হয়। আর নাম, ঠিকানা আর বয়স লিখতে ভুলো না।

(ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, জনসংযোগ বিভাগ, ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০১৭)

গণেশ বলে জানতেন—অকালে মারা যান।

১৯৪০ সালটি যতই এগোতে লাগল, দেশের রাজনীতিতে রাঙাকাকাবাবু ততই একঘরে হয়ে পড়তে লাগলেন। দক্ষিণপন্থী বা মধ্যপন্থীদের কথা ছেড়েই দিলাম, যাঁরা এখন নিজেদের খুব জোরগলায় বামপন্থী বলে প্রচার করে থাকেন, তাঁরাও কিন্তু সেই সঙ্কটের দিনে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে ছিলেন না। সংগ্রাম কিন্তু চলছিল। আপোস-বিরোধী সম্মেলনের পর আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে, তিনি যে-কোনো সময় গ্রেপ্তার হতে পারেন। সারা ভারতে তাঁর সহকর্মীদের জেলে পুরে ইংরেজ সরকার রাঙাকাকাবাবুকে মাসতিনেক ছেড়ে রেখে দিল। ইতিমধ্যে তিনি একটা নতুন ধরনের আন্দোলনের ডাক দিলেন। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হেয় করবার জন্য তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার নিদর্শন হিসাবে রাইটার্স বিলডিং-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে হলওয়েল মনুমেণ্ট ছিল। জাতির প্রতি এই অপমানের প্রতিবাদে ও মনুমেণ্টটি অপসারণের দাবিতে রাঙাকাকাবাবু সত্যাগ্রহ আন্দোলন করা ঠিক করলেন। তাঁর এই আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের যুবকদের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া গেল। রাঙাকাকাবাবু ঘোষণা করলেন যে, প্রথম দিন ৩রা জুলাই তিনি সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দেবেন। সেই দিনই দুপুরে তিনি গ্রেপ্তার হলেন।

জুলাই থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী ছিলেন। সেই সময় কয়েকবার বাড়ির অন্যদের সঙ্গে আমি জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। তাঁকে খুব প্রফুল্ল দেখাত। জেল-কর্মচারীদের সঙ্গে রসিকতা করে প্রায়ই বলতেন, "কী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর কত দিন?" তার পরেই বলতেন, "না, আপনারা ভয় পাবেন না। আপনারা যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন, আমরা যারা বন্দী আছি বেরিয়ে যাব, অন্য ধরনের বন্দী আসবে।" তখন কেই বা জানত যে, সেই সময় তিনি তাঁর জীবনের কঠিনতম সংকল্প নিতে যাচ্ছেন!

যেমন মান্দালয় জেলে বহুদিন আগে করেছিলেন, এবারও রাঙাকাকাবাবু স্থির করলেন যে, রাজবন্দীরা জেলে দুর্গাপূজা করবেন। গত্যন্তর না দেখে সরকার রাজি হয়ে

রাঙাকাকাবাবুদের দুর্গা প্রতিমা জেলের ভিতর থেকে বের করে আনা হচ্ছে। লেখকের তোলা ছবি

গেল। পুজোর সব যোগাড় অবশ্য বাড়ি থেকে দেওয়া হল। বিসর্জনের দিন বিকালে আমরা দল বেঁধে জেল গেট-এ উপস্থিত হলাম। লরি করে প্রতিমা জেল থেকে বের করে আনা হল। লরির পেছন-পেছন রাঙাকাকাবাবু ও অন্য বন্দীরা গেট পর্যন্ত এলেন। প্রতিমা বিসর্জনের ভার বাইরে সমবেত যুবকেরা নিলেন। অভ্যাসমতো আমি ব্যাপারটার কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম।

গ্রেপ্তারের পর থেকেই তাঁর বিনা বিচারে বেআইনি আটকের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে তিনি আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন, ঢাকা কেন্দ্র থেকে। দুর্গাপূজার পর থেকেই তিনি সরকারকে একটার পর একটা চিঠি লিখতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত কোনো সদুত্তর না পেয়ে তাদের জানালেন যে, যদি সরকার তাঁকে মুক্তি না দেয়, তাহলে তিনি আমরণ অনশন করবেন। চিঠিগুলি ইতিহাসের পাতায় গেঁথে রাখার মতো। একটি চিঠিকে তো তিনি নিজেই তাঁর জীবনের বাণী বলে চিহ্নিত করে গেছেন।

(ক্রমশ)

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদা ! রানীপালের সাদা ! সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সুতী, সিন্থেটিক আর ব্লেণ্ডেড-রানীপাল ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই ।

নিয়মিত রানীপাল লাগান... আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান

সুতীর কাপড়ের জন্য **রানীপাল ®**
সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়ের
জন্য **রানীপাল ® - এস**

Shilpi SG-2A/78 Ben

আগের কথা: শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে আক্রান্ত হয়েও সে বেঁচে যায়। আলাপ হয় রহস্যময় মানুষ সিংহিবাবুর সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমি তোমার শত্রু নই।" কে শত্রু? প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, সে কি তার খাবারের সঙ্গে কোনো ওষুধ মিশিয়ে দিত? ভবতোষ সান্যাল মানুষটি কেমন? টেলিগ্রামের ফর্মে তিনি ফর্দ লেখেন কেন? সিংহিবাবুর সম্পর্কে পুলিশই বা কী ভাবছে? তারপর....

॥ ২০ ॥

দুটো দিন একরকম চুপচাপ। -কিছু ঘটল না। ঘটলেও শিশিরের করার কিছু ছিল না। একে বেজায় কাঁচা সর্দি, নাক-গলা জ্বলে যাচ্ছে সর্বক্ষণ, তার ওপর বাড়িতে গোড়ালি মচকে ফেলে ল্যাংচাতে লাগল।

বংশী এসেছিল খোঁজ করতে। বলে গেল, সে ভবতোষবাবুর বাড়ির খোঁজখবর করছে।

শনিবার সন্ধেবেলায় বাবু এসে হাজির। খোঁজ করে-করে নিজেই হাজির হয়েছে। শিশির খুব খুশি। "আমি ভেবেছিলাম তোমার দেরি হবে আসতে।"

"পাগল! তোর চিঠি পেয়ে আর কি বসে থাকতে পারি। সাত দিনের ছুটি ম্যানেজ করে পালিয়ে এসেছি।"

"বেশ করেছ। এদিকে কত কী যে হয়ে যাচ্ছে, বাবুদা; পাগলা হয়ে যাচ্ছি।"

"তা তো বুঝতেই পারছি। সব শুনব।"

শশধর আর আশালতা দুজনেই বাবুকে দেখে খুব খুশি। আশালতা আগে থেকেই চিনতেন বাবুকে, কলকাতার বাড়িতে বহুবার দেখেছেন। শিশিরের প্রায় সব বন্ধুকেই চেনেন তিনি।

গল্পগুজব, হইহই করে সন্ধেটা কেটে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শিশিরের ঘরে দুজনে দু'বিছানায় শুয়ে কথাবার্তা শুরু হল। বাবুর জন্যে নেয়ারের খাট ঢোকানো হয়েছে ঘরে। বাবুর খুব আরাম লাগছিল। সে চুপ করে শুয়ে ছিল আর শিশির এক-এক করে বলে যাচ্ছিল সব। মাঝে-মাঝে বাবু দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করছিল।

সব শোনা হয়ে গেলে বাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "আঙটিটা তাহলে ফলস্?"

শিশির কোনো জবাব দিল না।

বাবু নিজেই বলল, "আঙটি ফলস্। কিন্তু তোকে নিয়ে এই শয়তানি করার পেছনে কার কী মতলব রয়েছে? তুই কারও সাতেপাঁচে নেই। তোর সঙ্গে কারও কোনো শত্রুতা নেই। তোর পেছনে লাগবে কেন?"

শিশির বড় করে নিশ্বাস ফেলল। "কী জানি!"

বাবু খানিকটা চুপচাপ থাকল। পরে বলল, "দ্যাখ, আমার মনে হচ্ছে যতক্ষণ না একটা মোটিভ বার করা যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা শুধু অন্ধকারেই ঢিল ছুঁড়ে মরব। একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় কারও আছে। কী উদ্দেশ্য?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না, বাবুদা।...আমার আরও অবাক লাগছে—আমাদের কলকাতার বাড়িতে এমন কে আছে যে প্রয়াগের চলে যাবার পরও আমায় ওষুধ খাওয়াত? বিশ্বাসই হয় না। সবাই পুরনো; সবাই বিশ্বাসী। আশ্চর্য!"

বাবু চুপ করে থাকল। ভাবছিল। অনেকক্ষণ পরে হাই তুলে বলল, "সিংহিবাবু লোকটাকে দেখিনি। তুই যা বলছিস তাতে মানুষটাকে তো খারাপ মনে হচ্ছে না। ওঁর কাছে সারেণ্ডার করবি নাকি? হয়তো অনেক কিছু জানেন উনি।"

শিশির বলল, "বংশী অন্য কথা বলছে।

তার মতে সিংহিবাবু ঘোড়েল। মানুষটির সম্পর্কে ঠিক করে কিছু না জেনে অতটা এগুতে বারণ করছে।"

বাবুর আবার হাই উঠল। ঘুম পাচ্ছিল তার। বলল, "কাল ভেবে দেখা যাবে। নে, ঘুমো। কাল তোদের সিংহিবাবুকে দেখব। বংশীর সঙ্গেও আলাপ হবে।"

বাবু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বংশী তখনও দোকানে আসেনি। কালুদা ছিল। শিশির আর বাবু দোকানে এল।

কালুদার সঙ্গে শিশিরের বেশ জানাশোনা হয়ে গিয়েছে। খাতির করে বসাল। বলল, "চা খাও দাদা। বংশীদা এই এল বলে।"

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। বংশী আর আসে না। শিশির যখন অধৈর্য হয়ে উঠেছে বংশী এসে হাজির। সাইকেলে করে এসেছে।

শিশির বলল, "বাঃ! কতক্ষণ ধরে বসে আছি। এই আমার বাবুদা।"

বংশী হাসল। "বুঝতে পেরেছি। কালুদাকে ছেড়ে দি।বাজার করে বাড়ি যাবে।"

দোকানে ঢুকে বংশী কালুদাকে টাকা দিল। কী কী নিতে বলেছে বাড়িতে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "একটু তাড়াতাড়ি করবে কালুদা, বেলা হয়ে গিয়েছে।"

কালুদা বাজারের থলি দোকানেই এনে রেখেছিল। টাকা আর থলি নিয়ে চলে গেল।

বংশী বসল। বসতে না বসতেই এক খদ্দের। টাকা-বারোর জিনিস বেচে বংশী বাবুকে বলল, "আপনি খুব পয়া, স্যার। পা দিতে না দিতেই খদ্দের।"

বাবু আর শিশির হেসে উঠল।

শিশির ঠাট্টা করে বলল, "আমি তোমার দোকানে বসে থাকলে খদ্দের আসে না বংশী?"

বংশী বলল, "আসে। কিন্তু বাবুদা আরও পয়া। একটা খবর আছে।"

শিশির তাকাল। "নতুন খবর?"

"হ্যাঁ।...আমার কি এমনি-এমনি দেরি হল নাকি? খবরের জন্যে গিয়েছিলাম। নিয়ে তবে ফিরছি।"

"কী খবর?"

"দাঁড়াও বলছি। চা খেয়েছ?"

"খেয়েছি। কালুদা খাইয়েছে।"

"তা হলে আমার জন্যে একটা হাঁক মেরে আসি—" বলে বংশী দোকানের বাইরে গেল।

বাবুর মজা লাগছিল বংশীকে দেখে। বলল, "খুব ছটফটে, তাই না?"

একটু পরেই ফিরে এল বংশী। এসেই শিশিরকে বলল, "আজ সকালে আমি ভবতোষ সান্যালের বাড়ি গিয়েছিলাম।"

শিশির প্রথমটায় খেয়াল করেনি। বোকার মতন তাকাল। "ভবতোষ...।"

"আরে সেই যে, যার বাড়ির কাজের লোক টেলিগ্রাম ফর্মের...।"

"ও! সেই বাজারের ফর্দের কাগজ?"

"হ্যাঁ।"

ব্যাপারটার কোনো গুরুত্ব শিশির সেদিন দেয়নি। আজও দিল না। তবে কৌতূহল বোধ করল।

বংশী বলল, "আমি একটা ছুতো করে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ির কাছে পৌঁছে মনে হল, ছুতোটা টিকবে না। দুদিন পরে কেউ যদি গিয়ে বলে সেদিন দেড় টাকা বেশি নিয়ে নিয়েছিলাম ভুল করে, ফেরত দিতে এসেছি, লোকে কি বিশ্বাস করবে! তার চেয়ে এমনি চলে যাওয়া ভাল।"

পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে বংশী বড় মাপের দুটিপ নস্যি নাকে ভরল। সারা নাকময় নস্যি, চোখ ছলছল করে উঠল।

নাক মুছে বংশী বলল, "কী করলাম জান?"

"শুনি।"

"সটান বাড়িতে ঢুকে সান্যালমশাইয়ের খোঁজ করলাম। ভদ্রলোক বসার ঘরে ডেকে পাঠালেন। নমস্কার করে বললাম, 'আমি এখানকার লোক। স্টেশনের কাছে বাজারে আমার একটা স্টেশনারি দোকান আছে। হয়তো আমায় দেখেছেন। আপনার বাড়ি থেকে মাঝে-মাঝে লোকজন গিয়ে খুচরো জিনিসপত্র কিনে আনে। কিন্তু স্যার, আমি বাঙালির ছেলে, ছোট্ট দোকান আমার। যদি দয়া করে আমার দোকান থেকে পুরো বাজারটাই নেন বড় উপকার হয়। তাছাড়া স্যার, আরও একটা কথা আছে। পুজোর সময় আমি কিছু বাড়তি জিনিস আনতে চাই। যদি বাড়ি থেকে আমায় আগেভাগে জানিয়ে দেন—কী কী লাগবে বাড়িতে, আমি আনিয়ে দেব।'" বলে বংশী হাসল। হাসির অর্থটা এই: কেমন চাল দিলাম বলো?

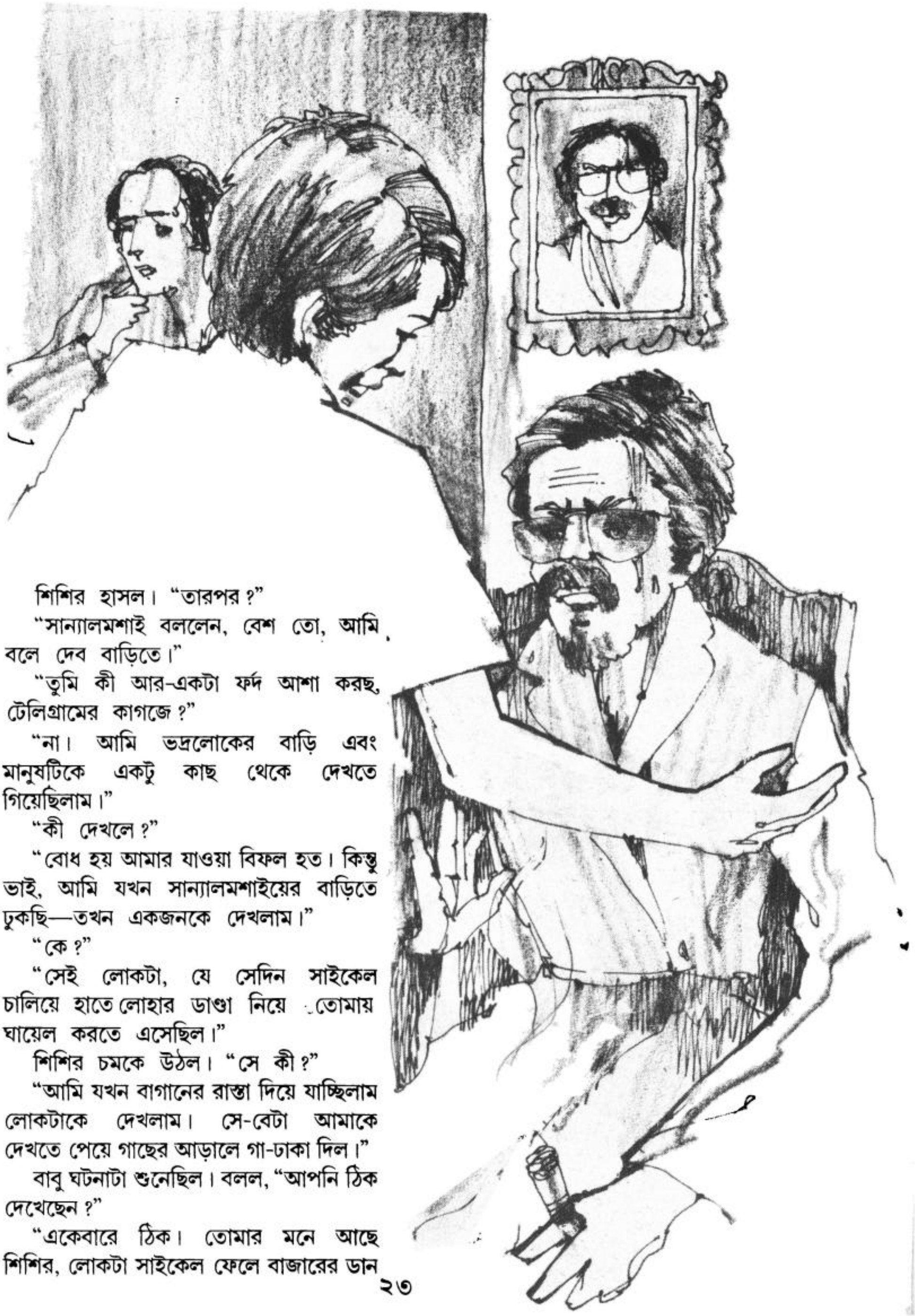

শিশির হাসল। "তারপর?"

"সান্যালমশাই বললেন, বেশ তো, আমি বলে দেব বাড়িতে।"

"তুমি কী আর-একটা ফর্দ আশা করছ, টেলিগ্রামের কাগজে?"

"না। আমি ভদ্রলোকের বাড়ি এবং মানুষটিকে একটু কাছ থেকে দেখতে গিয়েছিলাম।"

"কী দেখলে?"

"বোধ হয় আমার যাওয়া বিফল হত। কিন্তু ভাই, আমি যখন সান্যালমশাইয়ের বাড়িতে ঢুকছি—তখন একজনকে দেখলাম।"

"কে?"

"সেই লোকটা, যে সেদিন সাইকেল চালিয়ে হাতে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তোমায় ঘায়েল করতে এসেছিল।"

শিশির চমকে উঠল। "সে কী?"

"আমি যখন বাগানের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম লোকটাকে দেখলাম। সে-বেটা আমাকে দেখতে পেয়ে গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিল।"

বাবু ঘটনাটা শুনেছিল। বলল, "আপনি ঠিক দেখেছেন?"

"একেবারে ঠিক। তোমার মনে আছে শিশির, লোকটা সাইকেল ফেলে বাজারের ডান

প্রস্তুত হ'ল নতুন প্রেস্টীজ

১০০% সুরক্ষিত

Patent pending

এক অতি অপূর্ব 'গ্যাসকেট রিলিজ সিস্টেম' দ্বারা সর্বাধিক সুরক্ষা-পূর্ণ প্রেসার কুকার।

যখন খাদ্য-কণা ওয়েট ভাল্বকে বন্ধ ক'রে দেয় তখন কুকারের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রেসার সৃষ্টি হয়। এইসময় আপনার সুরক্ষা নির্ভর করে কেবলমাত্র সেফটি প্লাগ-এর উপর। কিন্তু আপনি কি ঠিক চিনতে পারবেন-কোনটি আসল বা কোনটি নকল? যদি প্লাগটি নকল হয় তার ফলে কি ঘটতে পারে তা-ও আপনি জানেন না।

তাই, পূর্ণ সুরক্ষা-র বিশেষ প্রশ্নটি চিন্তাধারায় রেখে-ই আমরা তৈরী করলাম এই নতুন প্রেস্টীজ! এর অপূর্ব্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' আপনার প্রেসার কুকারকে যে কোনো অবস্থায় নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত রাখবে; সেফটি প্লাগ-টি হ'য়ে যাবে অপ্রয়োজনীয়।

অপূর্ব্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম'—কিভাবে নতুন প্রেস্টীজ-কে ১০০% সুরক্ষা করে

সেফটি প্লাগ উড়ে যাওয়ার অনেক আগেই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' অনাবশ্যক ভাপ-কে ধীরে ধীরে সুরক্ষার সঙ্গে বার করে দেয়। কুকারের বিভিন্ন 'পার্টস' নকল বা পুরানো হলেও নির্ভরযোগ্য এই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' ঠিকমত কাজ চালিয়ে যায় —সদাসর্বদা!

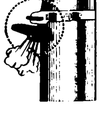

নতুন প্রেস্টীজ অধিক সুবিধাজনক

গাসকেট দ্বারা ভাপ বেরিয়ে আসার পর গাসকেট-টিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিন; মুহূর্তের মধ্যেই আপনার কুকার আবার কাজে প্রস্তুত! সেফটি প্লাগ-এর আর প্রয়োজনীয়তা নেই—তাই এটিকে বারবার বদলান-র ঝঞ্ঝাট বা নকল-এর চিন্তা থাকল না।

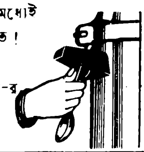

নতুন প্রেস্টীজ অনেক বেশী টেকসই

অনাবশ্যক ভাপ-চাপকে বিপদ সীমা-য় পৌঁছাতে দেওয়া হয় না; তাই কুকারের সাধারণ টুট-ফুট অনেক কম। অতএব, নতুন প্রেস্টীজ অবশ্যই অন্য কুকারের তুলনায় টেকসই।

নতুন প্রেস্টীজ-এর অন্যান্য লাভ

* অধিক টেকসই মোটা 'তল'
* স্টেনলেস স্টিল-এর নতুন স্ক্রু সমেত মজবুত হ্যাণ্ডেল
* মজবুতভাবে ধরা-র জায়গা সমেত 'অক্জি-লিয়ারী হ্যাণ্ডেল—যা গরম হয়ে যায় না।
* দৃঢ় আর মজবুত নতুন 'টিবেট'
* আকর্ষক ঝক্‌ঝকে চেহারা
* উপযুক্ত রন্ধন-পুস্তিকা
* ছয়টি সুবিধাজনক সাইজ-এ পাওয়া যায়।
* ১০ বছরের গ্যারান্টী

আর, গত ৩০ বছরে ভারতে সর্বাধিক লোকপ্রিয় প্রেসার কুকার 'প্রেস্টীজ'-এর বৈশিষ্ট্য।

tk উৎপাদন

Prestige

যারা ভারতে প্রথম প্রেসার কুকার প্রস্তুত করেছে

দিক দিয়ে ছুটেছিল?"
"হ্যাঁ, মনে আছে।"
"তার মানে বেটা সোজা ছুট মেরে মাঠ ভেঙে সান্যাল-বাড়িতে এসে ঢুকেছিল।"
শিশির একবার বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বংশীর দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। বলল, "ও-বাড়িতে লোকটা কী করে?"
"কাজকর্ম কিছু করে। নাও করতে পারে। সান্যালবাবুর গুণ্ডাও হতে পারে লোকটা।"
"বলছ কী?"
বংশী মাতব্বরের মতন মুচকি হাসল।
তার চা এসেছিল। চা নিল বংশী। ছোকরা চলে গেল চা দিয়ে।
চায়ে চুমুক দিয়ে বংশী বলল, "অবাক হবার আরও ব্যাপার আছে শিশিরবাবু।"
"শুনি।"
"ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে একজোড়া বাঘা কুকুর। কী ডাক! তবে চোখে দেখতে পেলাম না।"
"কুকুর থাকতেই পারে। অবাক হবার কী আছে?"
"না কুকুরের জন্যে হইনি। কিন্তু ও-বাড়ির বসার ঘরে সিংহিবাবুকে আসতে দেখলে কেমন হয়?"
শিশির অবাক। আকাশ থেকে পড়ল যেন। "সিংহিবাবু ! ও-বাড়িতে?"
"হ্যাঁ স্যার। ভদ্রলোক জানতেন না যে আমি ও-বাড়িতে গিয়েছি। আমায় দেখে ভেতরে ভেতরে ভদ্রলোক জোর চমকে উঠেছিলেন নিশ্চয়। মুখে সেটা বোঝালেন না। যেন আমায় চেনেন না।"
বাবু বলল, "দুজনে জানাশোনা আছে?"
"আলবাত আছে। সান্যালমশাই তুমি বলে কথা বললেন সিংহিবাবুর সঙ্গে।"
"তারপর?"
"তারপর আমায় ভদ্রভাবে তাড়িয়ে দিলেন।"
শিশির আর বাবু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। মাথায় কিছু ঢুকছিল না।
বংশী চা শেষ করল।
বাবু বলল, "দুজনের মধ্যে তাহলে ভাবসাব আছে?"
"নিশ্চয়।"
শিশির মাথা চুলকোতে লাগল। "ব্যাপার তো আরও জটিল হয়ে গেল, বাবুদা। তুমি বলছিলে সিংহিবাবুর কাছে সারেণ্ডার করতে। এ তো দেখছি, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।"
বংশী বলল, "আমি তোমায় বারবার বলছি শিশির, সিংহিবাবুর ভড়কিতে তুমি ভুলো না। ও গভীর জলের মাছ।"
"তাই দেখছি।"
সামান্য অপেক্ষা করে বংশী বলল, "ভাই, আমি আগে কোনোদিন ভবতোষ সান্যালের বাড়ির মধ্যে যাইনি। বাইরে থেকে দেখেছি। ভদ্রলোককেও দেখেছি এক-আধ দিন। গাড়িতে বসে আছেন। বাজারে গাড়ি এসেছে। উনি একপাশে বসে আছেন। কোনো দিন রাস্তায় নামেননি। চোখে সবসময় রঙিন কাচের চশমা, গগ্‌লস্ ধরনের। আজ ও-বাড়িতে গিয়ে দেখলাম—এলাহি কাণ্ড। পুরোনো বাড়ি না হলেও অন্যের বাড়ি কিনে কী কাণ্ড করেছে ভাই। খুব ধনী লোক। বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হল, দুর্গের মতন পাকাপোক্ত।"
বাবু বলল, "ভদ্রলোক কতকাল এখানে আছেন?"
"বছরখানেক।"
"কী করেন?"
"জানি না। কলকাতার লোক। ঠিকানা জানি না। তবে ভদ্রলোকের চেহারা সুন্দর। বনেদি চালচলন। চুরুট খান। গলা গম্ভীর।"
শিশির বলল, "সিংহিবাবুর কাছ থেকে ভদ্রলোকের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।"
"তুমিও যেমন," বংশী বলল, "তুমি ভদ্রলোকের খোঁজ করার আগে ভদ্রলোকই তোমার খোঁজ করে ফেলেছেন। আমারও ।"
শিশির হতাশ গলায় বলল, "না, আর আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। এত প্যাঁচালো ব্যাপার। আমার মাথায় ঢুকছে না কিছু।"
বংশী বলল, "হবে না কী হে! আলবাত হবে। হাল ছাড়ার পাত্র আমি নই।"
বাবু বলল, "বাড়িটা একবার দেখা যায় না?"
"বাইরে থেকে যায়। বিকেলে বেড়াতে যাবেন ওদিকে। দেখতে পাবেন। তবে ভেতরে ঢোকা মুশকিল।"
বাবু বলল, "বেশ, বাইরে থেকেই আজ একবার দেখে আসব।" (ক্রমশ)

ছবি সুনীল শীল

"বালো বালো, শক্ত
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে…"

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

কোলগেট টুথ পাউডার এক্কেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝক্ঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেণ্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

পাহাড়ি

বাসুদেব দেব

ডাকনাম তাঁর পাহাড়ি
টাকখান খুব বাহারি।
তামুক টেনে চার ছিলিম,
হঠাৎ ছোটেন দারজিলিং।
খেলেন পান খিলি কুড়ি,
পৌঁছে গেলেন শিলিগুড়ি।
হাঁকেন, 'ভাল আরশি আন্‌।'
চোখ মেলতেই কারশিয়াং।
দেখতে ইচ্ছে ডালিম-বন
অমনি গেলেন কালিম্পং।
দারজিলিং-এর রঙ্গিত,
শোনায় লোকসঙ্গীত।
মন বলে যেই 'খোল্‌ খাতা'
ফেরেন তখন কলকাতা।

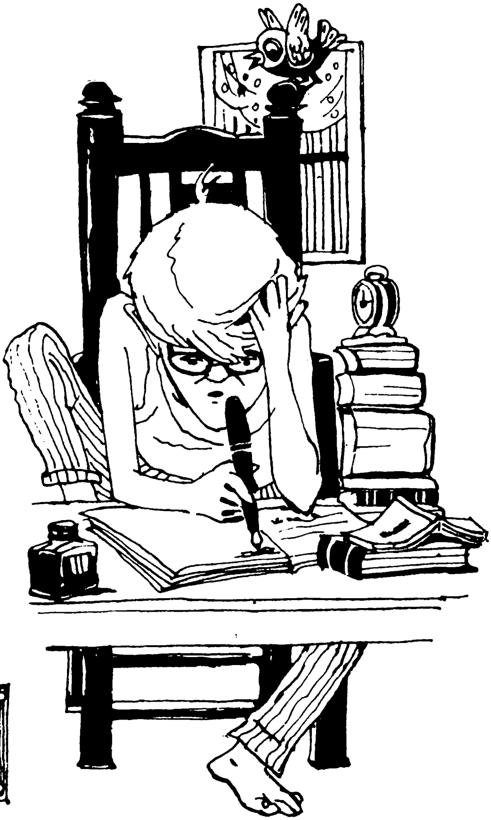

শুভঙ্কর

কবিরুল ইসলাম

তাহার নামটি শুভঙ্কর
পড়ে সে ক্লাস এইটে :
পণ্ডিত সে খুব অঙ্কর,
তুরুপের তাস এইটে।

বাংলা নিয়ে হামলা করে
দিনদুপুরে নিদ নেই,—
খাবে দাবে গামলা ভরে
ইংরেজিতে জিদ্‌ নেই!

নামটি তাহার শুভঙ্কর
ওস্তাদ সে খুব অঙ্কর॥

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বামন গাছ বনসাই

কমলেন্দু সরকার

এমন যদি হয়! তোমরা সবাই মিলে গল্প করছ এমন সময় তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন এক জাপানি মহিলা, তাঁর হাতের দুটি টবে বট আর অশ্বত্থ গাছ। মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা গাছ দুটির বয়েস আবার পাঁচশো বছর। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঘটনাটি সত্যি! এর নাম হল বনসাই বা বামন গাছ। টুকটুকে লাল, নীল, সবুজ ট্রে বা ছোট টবে রাখা হয় এই বামন গাছগুলো। এদের পাওয়া যায় ছবির মতন সাজানো দেশ জাপানে।

বনসাই শিল্পে বাহাদুরি দেখিয়েছে জাপান। এই কাজে জাপানিদের তুলনা মেলা ভার। বনসাই-এর অর্থ হল ট্রেতে পোঁতা গাছ। হর্টিকালচারের বিভিন্ন রকম কলা-কৌশল আর প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে ছোট করে রাখা হয় এই গাছগুলোকে, প্রয়োজন মতো গাছের আকৃতি বাড়ানো কমানো হয়।

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে চিন দেশে বনসাইয়ের প্রচলন ছিল। জাপানিরা

দ্বাদশ শতাব্দীতে বনসাই শেখে চিনাদের কাছ থেকে।

কাসুগা নামে এক জাপানি ভদ্রলোক বনসাইয়ের প্রথম প্রচলন করেন জাপানে। এর পরিচয় পাওয়া যায় তাকাশিনার পুঁথির (স্ক্রোল পেন্টিং) অলংকরণে।

বনসাই লম্বায় এক ইঞ্চিরও ছোট হতে পারে। আর বড় হলে চার ফুট কিংবা তার চেয়ে আর একটু বেশি। তবে বনসাইয়ের উচ্চতা হয় সাধারণত বারো থেকে ছাব্বিশ ইঞ্চির মধ্যে। যেগুলির উচ্চতা এক ইঞ্চিরও কম তাদের বলা হয় শিন্‌তো, যার অর্থ প্রাচীন। ভাবতে অবাক লাগে, এইটুকু উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক অতি বৃদ্ধ বৃক্ষ, যার বয়স হবে হয়তো পাঁচশো।

এই সব গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ডে বৈচিত্র্য আছে। সুতরাং এক-এক বনসাইয়ের এক-এক রকম নাম। যেমন—চোক্কান, কেংগাই, হাংকাং ইত্যাদি। জলপ্রপাতের ঢঙে নীচে নেমে-যাওয়া ঝালরগুচ্ছ বনসাইয়ের নাম কেংগাই। এই ধরনের বনসাইয়ের জন্য মেপল, অ্যাপেল, হ্যথর্ন, পাইন ইত্যাদি গাছের প্রয়োজন। সোজা কাণ্ডযুক্ত বনসাই হল চোক্কান। এর জন্য দরকার লার্চ, সাইপ্রিস, পাইন, ক্রিপটোমেরিয়া, ফার, ইত্যাদি গাছ। হাংকাং জাতের বনসাই হল বহুগাঁটযুক্ত গাছ। জিলকোভা, এলম, ট্রাইডণ্ট, মেপল ইত্যাদি গাছ এই ধরনের বনসাইতে লাগে। ঝাড়ুর মতো বনসাইয়ের জন্যে লাগে এলম, বার্চ, ওক ইত্যাদি গাছ।

বনসাইয়ে প্রধান ভূমিকা হল সবুজের। তাই বেছে নেওয়া হয় চিরসবুজ গাছের চারা। সাধারণত এই চারাগুলো সংগ্রহ করা হয় পাহাড়ি অঞ্চল থেকে। কিন্তু বর্তমানে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে চারা সংগ্রহ খুবই কষ্টকর এবং ব্যয়সাপেক্ষ। তাই কলমের চারা বা বীজ থেকেই বনসাই তৈরির কাজে বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। এই গাছগুলিকে সুন্দর আকৃতি দেবার জন্যে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। বাড়তি কুঁড়ি, পাতা ছেঁটে ফেলতে হয়, একটা ডাল বেঁধে দেওয়া হয় অন্য ডালের সঙ্গে। তার দিয়ে বাঁধার ফলে গাছ দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে না। ইচ্ছে মতো সরু বা মোটা করা যায়। বাঁধার

জন্যে দরকার সবচেয়ে ভাল তামার তার। এখন জাপানে অবশ্য অ্যালুমিনিয়াম তার ব্যবহার করা হয়।

ফুল ও ফলের গাছের চারাও ব্যবহার করা হয় বনসাই শিল্পে। যেমন–জুঁই, চেরি, ক্যামেলিয়া, ক্রিস্যানথিমাম, কমলা লেবু, আঙুর ইত্যাদি।

একটা বনসাই তৈরি করতে কতদিন সময় লাগে বলো তো? শুনলে চমকে যাবে! একটা বনসাই ঠিকমতো তৈরি করতে সময় লাগে চার থেকে পাঁচ বছর। একই ট্রে বা টবে একাধিক বনসাই তৈরি করা যায়। এই নিয়ে জাপানিদের মধ্যে একটা গল্প আছে। একটি ট্রে বা টবে অনেকগুলো বনসাই বোনা গেলেও জাপানিরা কখনোই চারটি বনসাই একসঙ্গে রাখে না। 'চার' সংখ্যাটা এরা সযত্নে এড়িয়ে যেতে চায়। কারণ, জাপানি 'চার' শব্দের উচ্চারণ এমন একটি শব্দের উচ্চারণের কাছাকাছি যার অর্থ 'মৃত্যু'। মৃত্যুকে কে আর ভালবাসে বলো? তাই সবাই 'চার' এড়াতে চায়। জাপানিরা একই জায়গায় বিজোড় সংখ্যার গাছ বুনতেই পছন্দ করে বেশি।

বনসাইয়ের মাটি তৈরি করার জন্যে খুব যত্ন নিতে হয়। সূক্ষ্ম ফোয়ারার মুখ-লাগানো পাত্রের সাহায্যে জল দিতে হয় বনসাইয়ের

মাটিতে। গাছগুলিকে খাবার দেওয়া হয় প্রতিদিন। ওদের বাড়ের সময় মোটামুটিভাবে মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। বনসাই সমেত ট্রে বা টবটি রাখা হয় উঁচু জায়গায়, যাতে বিশুদ্ধ হাওয়া পেতে পারে গাছ। মাঝে মাঝে দেখে নেওয়া হয় গাছের কোনো জায়গায় পচন ধরছে কি না! পচন ধরলে গাছের সেই অংশটা খুব সাবধানে কেটে ফেলা হয় ব্লেড দিয়ে।

জাপানে সবচেয়ে বেশি বনসাইয়ের চাষ হয় টোকিও থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে ওমিয়া গ্রামের বনসাই বাগানে। এই বাগানে হাজার হাজার একর জমি জুড়ে অসংখ্য গাছের চাষ হচ্ছে। বনসাই এখন রীতিমত লাভজনক ব্যবসা। বনসাই থেকে জাপান প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। এক-একটা বনসাই বিক্রি হয় আট-ন হাজার টাকায়।

এখন শুধু জাপান নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে বনসাই শিল্প। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় বনসাই শিল্প গড়ে উঠেছে প্রায় জাপানের সমান তালে। আমাদের এখানেও কলকাতা হর্টিকালচার সোসাইটিতে গিয়েও দেখে আসতে পারো এই জাপানি ম্যাজিক বনসাই।

রোভার্সের রয়
অস্ট্রেলিয়ায় আন্তজাতিক টুর্নামেন্টের ফাইনালে রয় ইতিমধ্যেই দুটি গোল দিয়েছে। বসরানের শেখ তো স্তম্ভিত!
আঃ!
পিছিয়ে এসে গোল ঠেকাল রয়!
দারুণ!
রয় এগোচ্ছে...
বল ঠেলে দাও জিমি!
নাও রয়!
বিদ্যুৎ-গতিতে এগোচ্ছে রয়!
গোল হবেই!
আহা, বাঁধিয়ে রাখার মতো গোল!
হ্যাট-ট্রিক!
রয়, এত খেটো না!
আরে, আমি সুস্থ হয়ে গেছি!
বসরানের শেখকে একটু শিক্ষা দিতে চাই!
তাই বলো!
শেখ তো রেগে আগুন!
লোকটা সত্যি উঁচু দরের খেলোয়াড়!
আমার খেলোয়াড়দের যেন নাচাচ্ছে!

খেটে খেলো। প্রতিটি গোলের জন্য দু লাখ টাকা দেব!
বলে কী!
বসরানের খেলোয়াড়রা মরিয়া হয়ে খেলছে!
কোনোক্রমে বাঁচিয়েছে চার্লি!
বল গেছে বসরানের স্ট্রাইকারের কাছে!
জোর হাঁকড়েছে!
গোল হবেই!
না! লফটি ঠেকিয়ে দিল!
ওদিকে রয়েছে নোয়েল ব্যাক্সটার!
উঃ, রোভার্স আজ দারুণ খেলছে!
আবার বল এসেছে বসরানের দিকে...
আবার গোল!
ভার্নন এলিয়ট!
রোভার্স দল ট্রফি নিচ্ছে...
মেলচেস্টার রোভার্স!
শাবাশ রয়!
আজ আমাদের না-জিতলে চলছিল না!
রোভার্সের ঘরে তখন উৎসবের আবহাওয়া...
আরে!
একটা কথা ছিল রয়!
শেখ!
আপনার টীম এখনও ভাল করে তৈরি হয়ে ওঠেনি!
জানি...
এখন তাকে তৈরি করবার ভার আপনাকেই নিতে হবে। তার জন্য আমি আপনাকে এক কোটি টাকা দেব!
এক শো লক্ষে এক কোটি! রয় কী করবে এখন?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

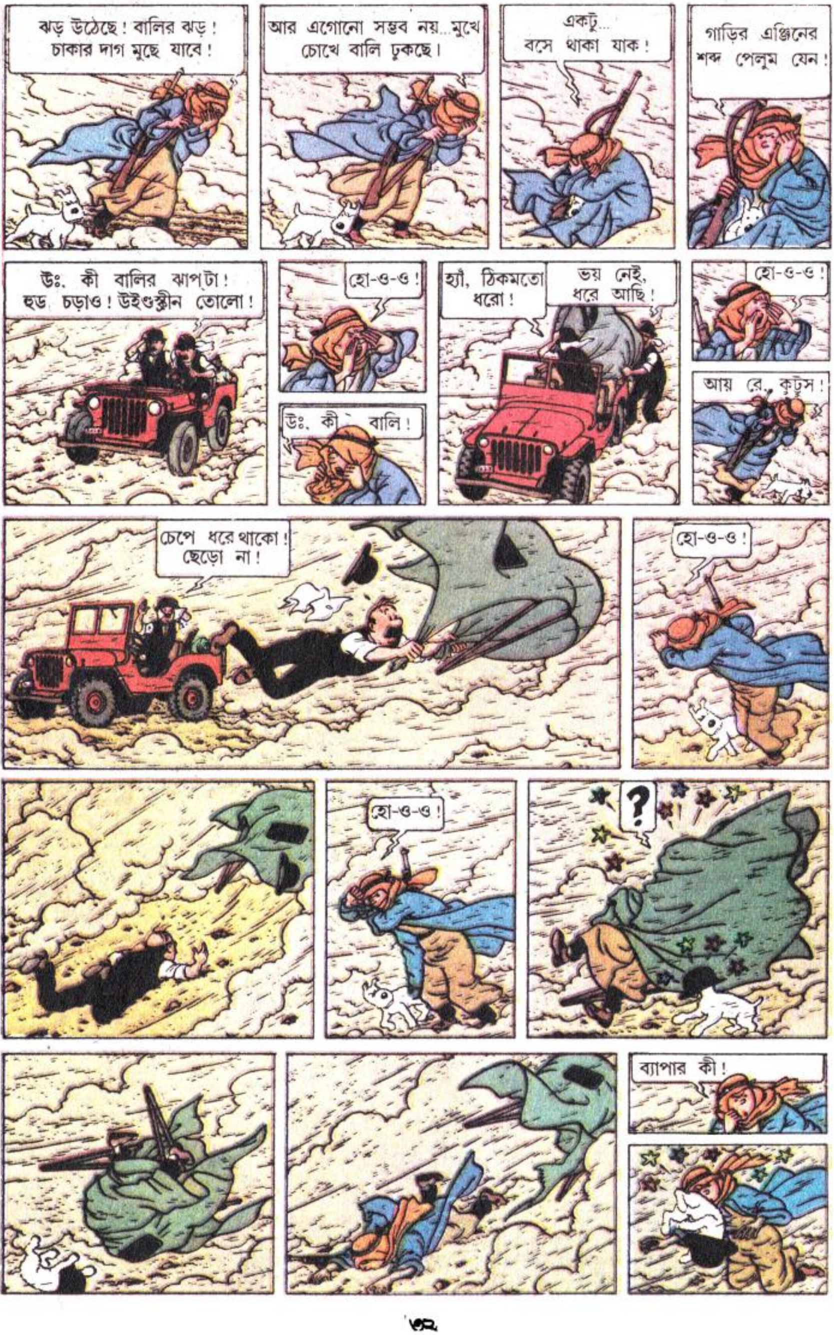
ঝড় উঠেছে! বালির ঝড়! চাকার দাগ মুছে যাবে!
আর এগোনো সম্ভব নয়...মুখে চোখে বালি ঢুকছে।
একটু... বসে থাকা যাক!
গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ পেলুম যেন!
উঃ, কী বালির ঝাপটা! হুড চড়াও! উইণ্ডস্ক্রীন তোলো!
হো-ও-ও!
উঃ, কী বালি!
হ্যাঁ, ঠিকমতো ধরো!
ভয় নেই, ধরে আছি!
হো-ও-ও!
আয় রে, কুট্টস!
চেপে ধরে থাকো! ছেড়ো না!
হো-ও-ও!
হো-ও-ও!
?
ব্যাপার কী!

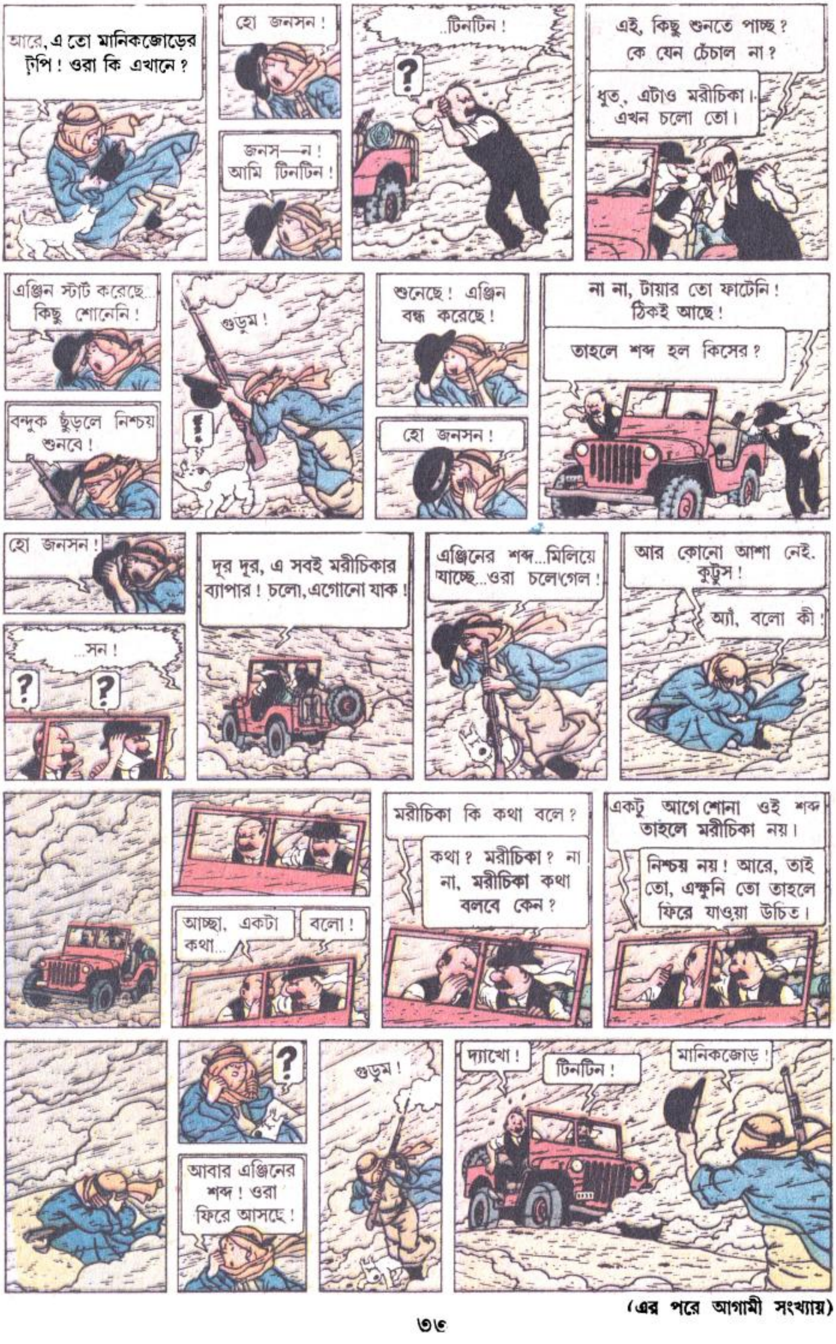

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১		■	২	■	৩	৪
	■	৫			■	
৬	৭	■		■	৮	
■	৯		■	১০		■
১১		■	১২	■	১৩	১৪
	■	১৫			■	
১৬		■		■	১৭	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) দ্রৌপদী। (৩) প্রাচীন ভারতের এক মহর্ষি। (৫) আরামদায়ক আসন। (৬) যার অভাবে ব্যঞ্জন বিস্বাদ। (৮) নৌকা। (৯) রাত্রি। (১০) শঙ্খ। (১১) যার আঘাত এক ধরনের শাস্তি। (১৩) পথ বা উপায়। (১৫) সাগর থেকে যে-শব্দের উৎপত্তি। (১৬) দিল্লির যে-খাবার প্রসিদ্ধ। (১৭) বাতাস যখন শরীরের ব্যাধি।

উপর-নীচ : (১) আগুন। (২) ছয়টি শিক্ষণীয় শাস্ত্র। (৪) পুঁটিমাছ। (৭) মহাকাশে যারা অসংখ্য। (৮) তানপুরা। (১১) আর-একটি বাদ্যযন্ত্র। (১২) সমবয়সী বন্ধু। (১৪) ধরা পড়ার পর অপরাধীকে যেখানে বাস করতে হয়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

মা	র্জা	র	■	খে	ল	না
দু	■	ঞ্জ	■	চ	■	ট
র	■	ন	ধ	র	■	ক
■	■	■	নু	■	■	■
ন্য	■	কা	ক	লি	■	উ
গ্রো	■	বু	■	টা	■	লূ
ধ	ব	ল	■	র	সি	ক

ধাঁধা

'হই-চই সঙ্ঘ' নামের সঙ্ঘটায় এখন আর হই-চই তেমন হয় না। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন ওই ক্লাবটাই ছিল আমাদের ধ্যান-জ্ঞান। প্রত্যেক দিন বিকেলে প্যারেড হত, হত ব্রতচারী গান আর নাচ। ছবি-আঁকা, প্রদর্শনী করা—সবই হত। ছোটকারাও তখন আমাদের অনেকভাবে সাহায্য করত।

এখন আমরা ক্লাব ছেড়েছি, অন্যান্য দিকে ব্যস্ততা বেড়েছে, ফলে ভুলেই গিয়েছিলাম 'হই-চই সঙ্ঘ'র অস্তিত্বের কথা। সেদিন দেখি, খুদে দু-জন ছেলে এসেছে আমার কাছে। তারা নাকি 'হইচই সঙ্ঘ' চালায় এখন। প্রাক্তন সভ্যদের নিয়ে একটা নাটক করতে চায়, তাই আমাকে দরকার।

কথাটা চলল বেশ কিছুক্ষণ। স্টেজে করার মতো পয়সা নেই। ছাদে কিংবা বড় হলঘরে হবে। জায়গা এখনও ঠিক হয় নি। নাটক অবশ্য বাছা হয়ে গেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাড়াটে চাই'। আমাদেরই দু-তিন জন পুরনো বন্ধুর নাম বলল, তারা নাকি রাজি হয়েছে। আমি সব শুনে আর না বলতে পারলাম না। রবিবার বিকেলে ক্লাব-ঘরে যাব, বলে দিলাম।

ছেলে দুটি খুশি মনে চলে গেল।

ছোটকাকে সন্ধেবেলা বললাম ব্যাপারটা। ছোটকা শুনল বেশ মন দিয়ে। তারপর কী করল জানো? একটা ধাঁধা ধাঁ করে চাপিয়ে দিল আমার ঘাড়ে। আর কী নিয়ে ধাঁধা জানো তো? নাটক নিয়ে। সেইটেই বলছি এবার। তোমরা দ্যাখো তো উত্তর পারো কি-না। আমিও চেষ্টা করছি।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা নাটকে ১২০ জন দর্শক এসেছে। মোট টিকিটও বিক্রি হয়েছে ১২০ টাকার। প্রত্যেক দর্শকই টিকিট কিনেছে। ভদ্রলোকদের টিকিটের দাম ৫ টাকা করে, ভদ্রমহিলাদের টিকিট ২ টাকা করে, আর ছোটদের জন্য টিকিট-পিছু ১০ পয়সা দাম ধার্য করা হয়েছে।

বলো তো, কারা কতজন দর্শক সেই নাটকে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ইংল্যাণ্ডে কি ১৫ই আগস্ট রয়েছে?

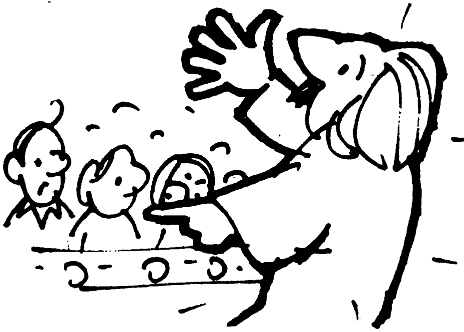

তৃতীয় ধাঁধা ॥ শব্দটার জট ছাড়াও—

সা রি গ ৎ থা ক স র

গতবারের উত্তর ॥ (১) তিন জনের বয়সের যোগফল যদি ৭০ বছর বাড়ে তাহলে প্রত্যেকের বয়স বাড়ছে ২৩ বছর ৪ মাস করে। তাহলে বাবার এখনকার বয়স ৫৮ বছর ৪ মাস – ২৩ বছর ৪ মাস বা ৩৫ বছর। ছেলের এখনকার বয়স এর ছ' ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ ৫ বছর ১০ মাস। সুতরাং মায়ের এখনকার বয়স ৭০ – (৩৫+৫ বছর ১০ মাস) বা ২৯ বছর ২ মাস। (২) উপানৎ, মানে জুতো। (৩) ০ থেকে ৯ পর্যন্ত সব কটি সংখ্যা রয়েছে, এবং রয়েছে বর্ণানুক্রমিকভাবে।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

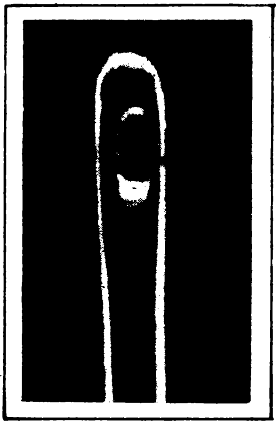

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল
হ্যারিকেনের পলতের ফোটো
ফোটো : তপন দাস

উত্তর বটে

প্রঃ বিলেত যাবার পথে আপনার মালটা কোন্ বন্দর থেকে তুলতে হবে?
উঃ মালটা থেকে।

প্রঃ আপনার কোনো আত্মীয় কি কয়েক বছর আগে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন?
উঃ শুনেছি একজন পেয়েছেন। তিনি আমার ঠিক কী হন জানি না, তবে খুড়া না, সেটা বলতে পারি।

প্রঃ সম্প্রতি মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে দুটো পুরনো কামান পাওয়া গেছে, ও দুটো নিয়ে কী করা যায় বলুন তো?
উঃ আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিতে পারো, বড় মশার উৎপাত হয়েছে।

প্রঃ কোন্ পাট খুব তাড়াতাড়ি ফলে?
উঃ হুটপাট।

সুসেন

মজার খেলা

বর্ষার সন্ধেবেলা; যখন বাড়ি থেকে বেরুনো শক্ত, কাজও তেমন নেই, তখনকার পক্ষে এই খেলাটা বেশ মজাদার। পাঁচটা ইন্দ্রিয় কেমন সজাগ তাই একবার ঝালিয়ে নেওয়ার খেলা এটা।

যারা খেলবে প্রথমে তাদের চোখ বেঁধে দাও রুমাল দিয়ে। এবার তাদের চারটে জিনিস চাখতে দাও। ধরো, মাখন আচার নুন ফল—এই ধরনের চারটে যে-কোনও জিনিস। তারা কিন্তু কেউ মুখে এখন কিচ্ছু বলবে না, শুধু মনে করে রাখবে কী চাখল। এর পরের পরীক্ষা গন্ধের। সাবান কেরোসিন কালি তেল—এই জাতীয় চারটে জিনিস তাদের নাকের সামনে ধরো। গন্ধে বুঝতে হবে কী জিনিস। এর পর স্পর্শ। কাপ পেনসিল দেশলাই আলু—এই

জাতীয় চারটে জিনিস হাত দিয়ে ছুঁতে দাও। চোখ কিন্তু এখনও বন্ধ। মুখে বলাও বারণ। শুধু মনে রাখা। চতুর্থ পরীক্ষা কানের। ধরো ঝুমঝুমি বাজালে, কী জল ঢাললে গ্লাসে বেশ শব্দ করে, কী হাততালি দিলে, অথবা গানের সুর শোনালে—এই রকম আর কী। এরপর, সবশেষে, চোখ খুলে দাও। একটা ট্রেতে চারটে জিনিস রেখে তাদের সামনে ধরো। এক মিনিটকাল রেখে সরিয়ে নাও।

এবার প্রত্যেককে কাগজ আর পেনসিল দাও। তারা পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে এতক্ষণ যা-যা করল, তার তালিকা লিখতে হবে প্রত্যেককে। কুড়িটা হবে মোট। যে সব থেকে বেশি ঠিকঠাক লিখবে, সেই জিতবে এই দারুণ মজার খেলাটায়।

মজারু

হাসিখুশি

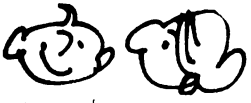

"জানো ঠাকুমা, বাবাকে এবার আর আমার জন্য কোনো নতুন বই কিনতে হবে না। গতবারের মতো এবারেও আমি ক্লাস ফাইভে থেকে গেলুম।"

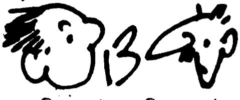

"তুমি একই বাড়িতে পাঁচবার চুরি করেছ কেন?"
"কী করব হুজুর; ওখান থেকে চুরি-করা কোনো জিনিসই আমার বাড়ির লোকের পছন্দ হচ্ছিল না!"

"শুনলাম, তুমি নাকি আজকাল খুব হনুমানের ছবি এঁকে বেড়াচ্ছ?"
"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। বোসো, তোমরাও একটা ছবি এঁকে ফেলি!"

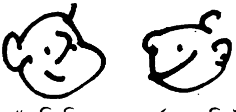

"তুমি কি জানো জর্জ ওয়াশিংটন তোমার বয়েসে কখনো মিথ্যে কথা বলতেন না।"
"জানি। কিন্তু আপনি কি জানেন জর্জ ওয়াশিংটন আপনার বয়েসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।"

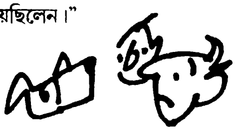

"টম সত্যিই খুব ভাল কুকুর। ওকে ভয় কোরো না। ও যখন ঘেউঘেউ করে, তখন কাউকেই কামড়ায় না।"
"তার মানে তুমি বলতে চাইছ, ও যখন কাউকে কামড়ায় তখন একদম ঘেউঘেউ করে না?"

ছবি অহিভূষণ মালিক

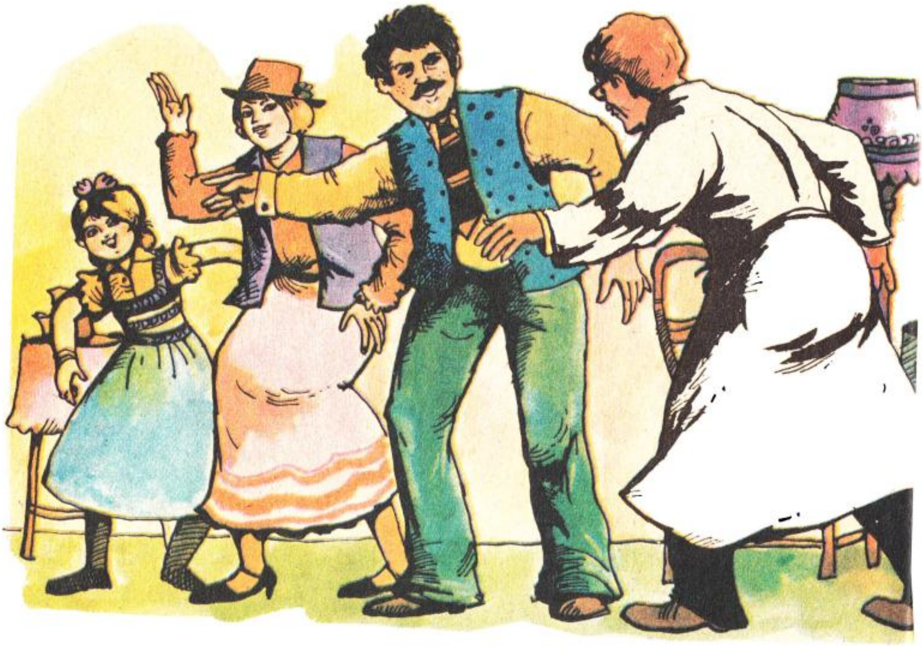

জ্যাক

(ইংল্যাণ্ডের উপকথা)

আরতি দাস

জ্যাকের মা মারা যাবার পরে ওর বাবা আবার বিয়ে করে আনলেন এক মহিলাকে।

শুরু থেকেই ওর দ্বিতীয়-মা সুনজরে দেখেননি ওকে। ফলে, ভারী মুশকিলে পড়ে গেল জ্যাক। বাড়িতে ভাল খাবার-দাবার যা হয় তার কিছুই ওর ভাগ্যে জোটে না। যেটুকুও বা খেতে পায়, তাতে পেটের এক কোনাও ভরে না। মুখ বুজে খিদের কষ্ট সইতে পারো ভাল। নয়ত, মুখ ফুটে বললেই আচ্ছাসে কান মুচড়ে, দ্বিতীয় মা বুঝিয়ে দেন, বার বার খেতে চাওয়াটা খুব বেয়াদবি।

দিন-দিন জ্যাক রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখে ওর বাবা শেষটায় গরু চরাবার কাজে লাগিয়ে দিলেন ওকে। স্ত্রীকে বলে দিলেন, সকালবেলাই যেন জ্যাকের সারাদিনের খাবারটা সঙ্গে দেওয়া হয়। সেই থেকে সারাদিনের খাবার নিয়ে, ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়ে জ্যাক।

কাজটা ভালই লাগে ওর। খোলা মাঠে দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া। গাছগাছালিতে পাখির ডাক। তাছাড়া কানমলাও খেতে হয় না। সব চেয়ে বড় কথা, পেট ভরে খেতে পাচ্ছে রোজ। তবে সাঁঝের বেলা বাড়ি ফিরলেই, আবার সেই কানমলা আর চড়-চাপড়।

একদিন দুপুরবেলা মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে বসে আছে জ্যাক, এমনসময় থুত্থুড়ে এক বুড়ো লাঠি ঠুক-ঠুক করে এগিয়ে এল ওর দিকে। কথায়-কথায় জানতে পেল, সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি বুড়োর। খিদের কষ্ট যে কী তা বেশ ভালভাবেই জানা আছে ওর। তাই বুড়োকে বসিয়ে নিজের সারাদিনের খাবারটা খেতে দিল।

খেতে পেয়ে বুড়ো তো খুব খুশি। চেটেপুটে সব খেয়ে, ছেঁড়া রুমালে মুখ মুছে বলল, "খেতে দিয়ে আমায় বাঁচালে তুমি। অনেক ধন্যবাদ। এখন বলো, কী চাই তোমার। খুশিমতন যে-কোনো তিনটে জিনিস চাইলেই পাবে তুমি।"

তিন-টে! স্ফূর্তির চোটে একটু নেচে নিল জ্যাক। তারপর নাচ থামিয়ে গানের সুরে বলল:

তিনটি জিনিস চাই রে আমার
তিনটে জিনিস চাই।
প্রথমটা তার ধনুক হবে
তীর ছুঁড়ব সাঁ-ই।

উড়াল পাখ পড়বে ভুঁয়ে
সন্দেহ তায় নাই

জ্যাকের গানের তালে বুড়ো এতক্ষণ হাঁটুতে তাল ঠুকছিল. গান শেষ হতে হাততালি দিয়ে গেয়ে উঠল:

মন্ত্রপড়া এমন ধনুক
আছে আমার. এক
চোখ বুজে তীর ছুড়লে. পাখি
মরবে. ও ভাই জ্যাক।

এই-না বলে ঝোলার থেকে ধনুকটা বার করে দিল। তারপর শুধোল. "আর কী চাও তুমি?"

এবারে একটা বাঁশি চাইল জ্যাক।

বাঁশির কথায় বুড়ো খুব একচোট হেসে নিল। তারপর হাতে তাল বাজিয়ে উঠল:

এমন বাঁশি দেব তোমায়
ছোট্ট ছেলে জ্যাক
বাঁশির সুরে পুকুর ছেড়ে
পাতিহাঁসের ঝাঁক—
তড়তড়িয়ে নাচবে ডাঙায়,
চেঁচাবে প্যাঁক-প্যাঁক।
যে শুনবে সেই বাঁশি, নেচে
উঠবে মহানন্দে,
মানুষ, গরু, শুয়োর, ভেড়া
নাচবে সকাল-সন্ধে।

বাঁশির কথায় জ্যাক তাজ্জব। তিনটে ডিগবাজি খেয়ে বলল:

সত্যি নাকি এ-সব কথা?
এ যদি হয় সত্যি.
মন্ত্রপড়া বাঁশি নিতে
নেই কোনো আপত্তি

বাঁশিটা দিয়ে জ্যাকের তৃতীয় ইচ্ছেটা কী জানতে চাইল বুড়ো. তখন বুড়োর কানেকানে ফিসফিস করে যা বলল জ্যাক. তা শুনে মুচকি হাসল বুড়ো বলল. "বেশ তো. যা চাইছ তাই হবে।"

আসলে জ্যাক চাইছিল. ওর দ্বিতীয় মা যখনই কটমটিয়ে তাকাবেন ওর দিকে, তখনই যেন খুব চেঁচিয়ে গালাগাল দেন জ্যাককে। তিনটে ইচ্ছে পূরণ করে বুড়ো চলে গেল। সূর্য ডুবতে আর দেরি নেই দেখে সব গরু জুটিয়ে জ্যাকও রওনা দিল বাড়ির দিকে।

যেতে যেতে মাঝপথে কী খেয়াল হল জ্যাকের, ভাবল, বাঁশিটা বাজিয়ে দেখাই যাক না, বুড়োর কথা কতদূর সত্যি।

এই ভেবে বাঁশিতে ফুঁ দিতেই, আশ্চর্য নাচের সুর বেজে উঠল। সুরটা কানে যেতেই—

নেচে উঠল গাইগরুটা,

বকনা বাছুর, আর
লেজ তুলে নাচ দেখাচ্ছিল
মস্ত বড় ষাঁড়।
রাস্তাচলা ভিড়ের মানুষ
নাচ দেখতে এসে,
ঘুরে ঘুরে নাচন শুরু
করল, অবশেষে।

এক পাদরিমশাই যাচ্ছিলেন ওই রাস্তায়। তাঁর আর গির্জায় যাওয়া হল না। গাইগরুর পাশটিতে দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে চললেন তিনি। একপাল গরু, পাদরিমশাই আর জনা-পঁচিশ লোক জ্যাকের পেছনে নেচে নেচে চলে এল ওর বাড়ির কাছে। তখন বাঁশি থামিয়ে ঘরে ঢুকল জ্যাক। খিদে-তেষ্টায় ভীষণ কাবু এক বুড়োকে আজকের খাবারটা দিয়েছে জ্যাক। এ কথা ওর মুখে শুনেই ওর বাবা পকেট থেকে ডবল পেনি বার করে যেই না দিতে যাবেন, জ্যাকের দ্বিতীয়-মা কটমটিয়ে তাকালেন ওর দিকে।

বাস, আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়-মার মুখ থেকে বিকট চিৎকার আর বিশ্রী গালাগাল বার হতে লাগল। জ্যাকের বাবা তো থ। বাবার জোর ধমক খেয়ে ঘরের কোণে গিয়ে কাঁদতে বসলেন মহিলা।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না! জ্যাককে জব্দ করার জন্য সেই রাত্রেই পাদরির কাছে গেলেন তিনি। "আচ্ছাসে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিন জ্যাককে। জ্বালিয়ে খাচ্ছে একেবারে," বললেন ওর দ্বিতীয় মা।

রাগ পাদরিমশাইয়েরও কম নয়। সারা বিকেল একপাল গরুর সঙ্গে নাচিয়ে, ওঁকে খুব অপদস্থ করেছে জ্যাক। তাই বেশ করে জ্যাকের কান মলে দিতে পরদিন পাদরিমশাই মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

যেই-না জ্যাকের কান চেপে ধরতে যাবেন, খুব কাকুতি-মিনতি করে এক মিনিট সময় চাইল জ্যাক। সময় দিলে ও একটা মজা দেখাবে পাদরিমশাইকে।

বেশ বড়-সড় একটা লেজঝোলা পাখি বসে ছিল গাছের ডালে। ধনুকটা তুলেই তীর ছুঁড়তে ঝুপ করে পাখিটা পড়ে গেল নীচের ঝোপে। অমনি পাদরি ছুটলেন ঝোপের দিকে। ঝোপের মধ্যিখানে ঢুকে পাখিটা তুলে নিতেই বাঁশি বাজিয়ে দিল জ্যাক। তক্ষুনি কাঁটাবনের মধ্যেই নাচ শুরু হয়ে গেল পাদরির।

সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার! কাঁটার খোঁচায় পাদরির হাত-পা-গা ছড়ে-কেটে রক্তারক্তি। হাতের মুঠোয় পাখি নিয়ে নাচছেন আর চেঁচাচ্ছেন, "আরে থামো, থামো। নেচে নেচে মরে যাব যে!"

চিৎকার শুনে আশপাশের লোক নাচতে নাচতে ছুটে আসছে দেখে, জ্যাক বাঁশি থামিয়ে দিল। তখন টেনে হিঁচড়ে পাদরিকে বার করা হল ঝোপ থেকে। এরপর সবাই মিলে জ্যাককে ধরে নিয়ে গেল ওর বাবার কাছে।

জ্যাকের বাবা তো বিশ্বাসই করতে চান না ব্যাপারটা। তখন বাবার হুকুমে বাধ্য ছেলের মতো বাঁশিতে ফুঁ দিল জ্যাক। ফল হল কী—

পাদরিমশাই নাচেন যত
ততই নাচেন বাবা,
নাচে জ্যাকের পোষা কুকুর,
সামনে তুলে থাবা।
নেচে নেচে শাপশাপান্ত
করছে জ্যাকের মা,
হেসে হেসে নাচছে পাড়ার
বুড়ো ঠাকুর্দা।

এত নেচে পাদরিমশাইয়ের পা দুটো খসে পড়ার জো হল। বাঁশি থামতেই বসে পড়লেন তিনি। জ্যাকের বাবা কিন্তু আচমকা এমন নাচতে পেয়ে খুব খুশি। কোনই ফয়সালা হচ্ছে না দেখে পাড়ার সবাই জ্যাক আর ওর বাবাকে নিয়ে কোর্টের দিকে চলল। জ্যাকের বিচার চাই। সবার পিছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গেলেন পাদরি।

সকলের নালিশ মন দিয়ে শুনে মামলার রায় দিতে উঠলেন জজ। অমনি বাঁশি বাজিয়ে দিল জ্যাক। চক্ষের পলকে চেয়ার-টেবিল উলটে দিয়ে নেচে উঠলেন জজসাহেব।

বাঁশির আওয়াজ শুনে, উকিল, মক্কেল, পেশকার, সাক্ষী নাচ শুরু করে দিল। আদালতের পেয়াদা, পাইক, আর্দালিরা জজসাহেবকে ঘিরে নাচতে লাগল।

সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। এত নেচে দু চোখ কপালে উঠল পাদরির। বাঁশি থামতে নাচ থামিয়ে জজসাহেব বসে পড়লেন মাথা নিচু করে। মিনিট দশেক বিশ্রাম নেবার পরে জ্যাককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার জন্য কী করতে পারি বলো।"

জ্যাক বলল, "আমি বাড়ি ছাড়তে চাই। আজ থেকে আমি স্বাধীন।"

"বেশ তাই হবে।" জজের রায় শুনে ধনুক আর বাঁশি কাঁধে ঝুলিয়ে, বাবার কাছে বিদায় চাইল জ্যাক।

তারপর নিজের গাঁ-ঘর ছেড়ে শহরের অচেনা রাস্তা ধরে বহু দূরে চলে গেল।

ছবি দেবাশিস দেব

কাকদের সভা

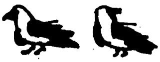

সেদিন দুপুরে পড়তে পড়তে চোখ পড়ল সামনের বাড়ির ন্যাড়া ছাতের ওপর। ছাতের চারদিকে অনেক কাক। একদিকে বেশ কয়েকজন ছোকরা কাক, অন্য দিকে প্রবীণের দল। অনেকক্ষণ সভা বসেছে, কিন্তু সভাপতির দেখা নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সভাপতি অসুস্থ। কী ব্যাপার? আসলে, কাল একটা নেমন্তন্নবাড়িতে খুব বেশি খাওয়াদাওয়া করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সভাপতি।

সভার সবাই তাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ-কেউ নানা রকম মন্তব্য করছে। এই কাকসমাজের মধ্যে দুটি কাক দুই দলের নেতা। এক দল কাক বলল, "আমাদের কালোমানিককে সভাপতি করা হোক।" আর এক দল বলল, "আমাদের বক্রচঞ্চুকে সভাপতি করা হোক।" এই নিয়ে দুই দলের মধ্যে বেধে গেল তুমুল ঝগড়া। হঠাৎ বিশাল এক চিল এসে এমন এক ছোঁ মারল যে, কাকদের সভা ভেঙে গেল একেবারে।

রাহুল গুহ
(বয়স ১৩)

গুপির কথা

এক যে ছিল ছেলে
সে চলত হেলে দুলে
তার নামটি হল গুপি
তার মাথায় লাল টুপি

সুপর্ণা বসু
(বয়স ৭)

বৃষ্টি পড়ে

টুপ-টুপ-টুপ বৃষ্টি পড়ে
ঝম-ঝম-ঝম শব্দ হয়
ঝুর-ঝুর-ঝুর পাতা নড়ে
মনটা আমার ভাল নয়

নীপমঞ্জরী বর্মণ
(বয়স ৬)

নামতার ছড়া

তিন চার পাঁচ
কংসাবতীর বাঁধ
ছয় সাত আট
দামোদরের ঘাট
নয় দশ এগারো
সবাই মিলে চলো
পনেরো ষোলো সতেরো
হাওড়া ফিরে এসো

সুমিতকুমার বসু (বয়স ৯)

তোতনের স্বপ্ন

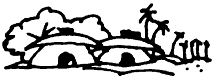

দূরের আকাশে সূর্য ডুবু-ডুবু। সূর্যের মিষ্টি লাল আলো এসে পড়েছে। সারা আকাশ লাল হয়ে গেছে। তোতন গ্রামের ছেলে। ওর ছোট মনটাও প্রকৃতির রূপে আনন্দে ভরে উঠেছে। তোতনদের গ্রামে তাদের ছোট্ট মাটির বাড়িটির ছাত খড়ের চালা দিয়ে তৈরি। তোতনের মা তোতনকে একবাটি মুড়ি আর বাতাসা দিয়েছেন খেতে। সামনে পড়ার বইগুলো ছড়ানো আছে। ঝপ্ করে অন্ধকার নামতেই হ্যারিকেন জ্বলে উঠল। তোতন বর্ণপরিচয় পড়তে লাগল। রাত নটা বাজতে না বাজতেই তোতন ঘুমে ঢলে পড়ল। তোতনের মা তোতনকে উঠিয়ে খাইয়ে দিলেন।

তোতনদের খুব সাধারণ সংসার, এক কথায় গরিব বলা চলে। এদিকে হয়েছে কি, তোতন ঘুমের মধ্যে এক অজানা পরীর দেশে চলে গেছে। তোতন দেখছে, সে এক নীল সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে। নীল সাগরের সব নীল-নীল ডানাওয়ালা জলপরী ওকে ঘিরে নাচছে। কী সুন্দর দেখতে সবাইকে! নাচ হয়ে গেলে ওরা তোতনকে নিয়ে ভুশ করে জলের মধ্যে ডুবে গেল।

সকালে তোতনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ভেবেছিল, সকালে উঠে পরীদের সঙ্গে মজা করবে। কিন্তু হায়, কোথায় গেল সেই পরীর দেশ! সে দেখল, সে শুয়ে আছে তার ছোট্ট গ্রামের বাড়িতে।

সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায়
(বয়স ১২)

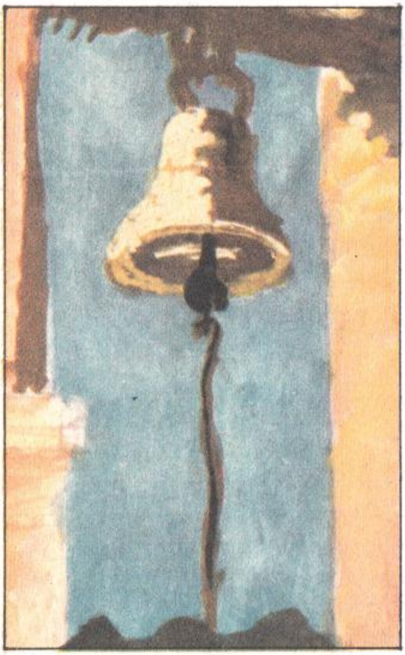

ছবি এঁকেছে সায়ন মিত্র (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে সুনন্দ পাল (বয়স ৬)

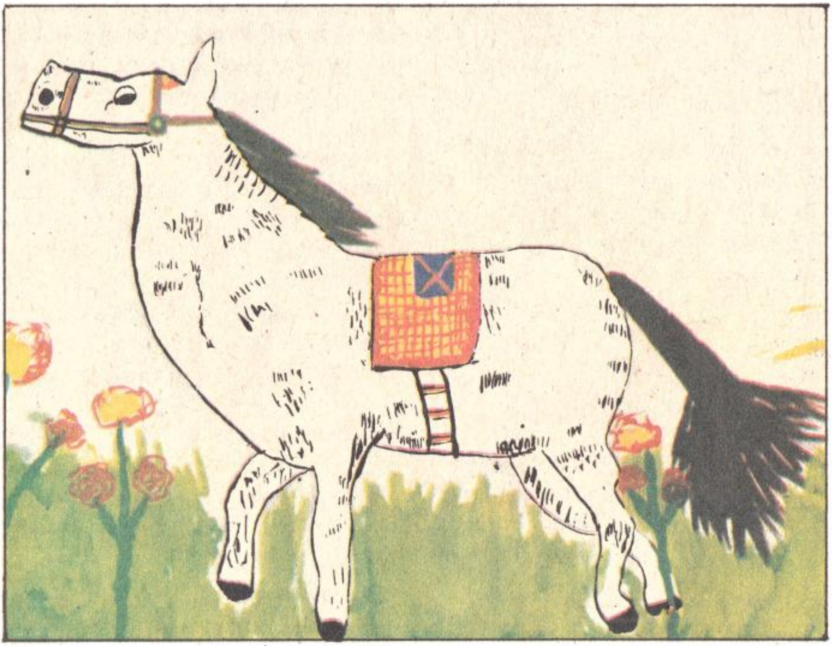

ছবি এঁকেছে কৌশিক মণ্ডল (বয়স ৮)

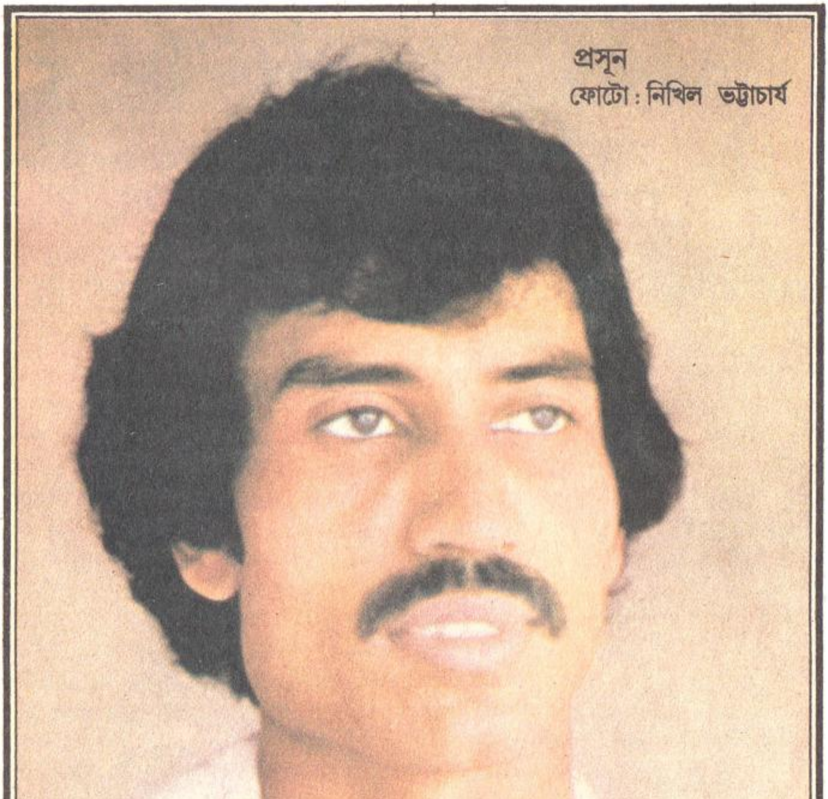

প্রসূন
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

 (পাতা ওলটালেই ফুটবলের খবর)

শত বর্ষ আগে

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

কলকাতার ওয়ালটার লকের দোকানের সামনে হঠাৎ একদিন হাজার-হাজার লোকের ভিড় জমে গেল। সকাল-দুপুর-সন্ধে সব সময়েই লেগে আছে—যেন মধুর কলসিকে ঘিরে মাছির ঝাঁক। একদিন কি দু'দিন নয়, একেবারে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

ব্যাপারটা কী? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দেখবার মতো একটা জিনিস এসেছে সাহেবদের দোকানে। বল খেলার প্রাইজ। কালো কুচকুচে কাঠের ওপর রুপোর পাত বসানো, তাতে আবার ছবি আঁকা। বল খেলার ছবি। আরও কত কী! দোকানঘরটা যেন আলো হয়ে রয়েছে ঝকঝকে রুপোর জৌলুসে। প্রাইজটার নাম নাকি শীল্ড। যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া—মানুষের বুক-সমান উঁচু। সেরকম খাটো মানুষ হলে ওর পেছনে আড়াল হয়ে যাবে। সত্যি, সাহেবদের রুচি আছে বটে। খাস বিলেতে তৈরি জিনিসটা—লণ্ডনের এলকিন্‌টন্ কোম্পানি তৈরি করেছে। ওয়ালটার লক ওদেরই এজেন্ট।

সবাই বলতে লাগল, ধন্য সাহেবরা! আর, ধন্য বৌবাজারের সর্বাধিকারীদের বাড়ির ছেলে নগেন্দ্রপ্রসাদ! সে-ই তো সাহেবদের খেলাটা আমদানি করেছে এদেশে পনেরো-ষোলো বছর আগে। তখন তার কতই বা বয়েস—বছর-দশেক। পড়ত গোলদিঘির কাছে হেয়ার স্কুলে। সেই খেলা এতই ছড়িয়েছে যে, এবার কম্পিটিশন হবে নানা দলের মধ্যে। শেষ অবধি যারা না হেরে যেতে পারবে তারাই পাবে ওই প্রাইজটা, মানে শীল্ড। শীল্ড দেখা হল। এবার কলকাতা পাগল হয়ে উঠল শীল্‌ডের খেলা দেখবার জন্যে।....

সেই পাগলামো আজও আছে। সেই ১৮৯৩ সালের তুলনায় আজ অবশ্য সেটা বহুগুণ ব্যাপক। তার চরিত্রও পালটেছে। 'সদ্যোজাত' আই. এফ. এ শীল্ডকে কেন্দ্র করে সেদিন যে কৌতূহল ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, আজ সেটা অনুভব করা যায় মাত্র, কাউকে ঠিক বোঝানো যাবে না।

আই এফ এ শীল্‌ডের কথা বলতে গেলেই সবচেয়ে আগে উঠবে যে ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নামে ওই শীল্ড, তার কথা। বস্তুত, আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা চালানোর জন্যেই আই এফ এ-র জন্ম। তাই শীল্ড এসেছে আগে, লীগ পরে। লীগ শুরু হয়েছে ১৮৯৮ সাল থেকে।

আই এফ এ ও তার শীল্‌ডের জন্মের পেছনে যে ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে তা হল ১৮৯২ সালে দুর্ধর্ষ মিলিটারি দল ইস্ট সারেকে হারিয়ে শোভাবাজার ক্লাবের ট্রেডস কাপ জয়। শোভাবাজার অবশ্য বাঙালির প্রথম ক্লাব নয়। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদের হাতে-গড়া এই ক্লাবটির অবদান এই দেশের ফুটবলের ইতিহাসে অসামান্য। নির্দ্বিধায় বলা যায়, শোভাবাজারের ট্রেডস কাপ পাওয়ার গুরুত্ব ১৯১১ সালে মোহনবাগানের আই এফ এ শীল্ড পাওয়ার চাইতে কোনো অংশেই কম নয়। আই এফ এ শীল্‌ডের আবির্ভাবে ট্রেডস্ কাপের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় এবং শোভাবাজার ক্লাব লুপ্ত হওয়ায় ওই ঐতিহাসিক ঘটনার যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। সেবার শোভাবাজার না-জিতলে আই এফ এ-র জন্মলগ্ন হয়তো পিছিয়ে যেত।

শোভাবাজারের জয়ে উৎসাহিত হয়ে ট্রেডস কাপে দেশী-বিদেশী এত দল অংশ নিতে এগিয়ে এল যে, তার পরিচালনার জন্যে একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রয়োজন দেখা দিল। এখানেও উদ্যোগ নিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ। তখনকার সব ক্লাবের প্রতিনিধিদের এক সভা ডাকলেন ১৮৯২ সালের শেষের দিকে। সভা ডাকা হল শোভাবাজার ক্লাবের তাঁবুতে। অক্টারলোনি মনুমেন্টের (বর্তমান শহীদ মিনার) উত্তর-পশ্চিমে ছিল এই তাঁবু।

স্মরণীয় সেই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডালহৌসি (ট্রেডস) ক্লাবের অবৈতনিক সম্পাদক এ আর ব্রাউন, ওই ক্লাবেরই নাম-করা ফরোয়ার্ড বি ও সি লিণ্ডসে, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের লেফট-হাফ ওয়াটসন। নগেন্দ্রপ্রসাদ তো ছিলেনই। সবাই মিলে ঠিক করলেন পরের বছর থেকেই একটা ফুটবল টুর্নামেণ্ট শুরু করা হবে। ভারতের নানা প্রান্তের ফুটবল টীম তাতে অংশ নিতে আসবে।

ওই প্রতিযোগিতার জন্যে একটা প্রস্তুতি কমিটি তখনই তৈরি করা হল। কমিটিতে রইলেন তিন সাহেব—ব্রাউন, লিণ্ডসে ওয়াটসন—ও একজন ভারতীয়। নগেন্দ্রপ্রসাদ। কমিটির নাম দেওয়া হল ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সভাপতি হলেন মিঃ জাস্টিস ম্যাকফারসন, সম্পাদক হলেন ব্রাউন।

কমিটি তো হল, এখন শীল্ডের টাকা আসবে কোত্থেকে? সারা ভারত থেকে দল আসবে, যেমন-তেমন একটা জিনিস হলেই তো আর চলবে না। তাই নগেন্দ্রপ্রসাদ ছুটলেন কোচবিহারের মহারাজার কাছে, পাতিয়ালার মহারাজার কাছে। পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। তার মূল্য আজ কত টাকা হবে? হিসেব করতে সাহস হয় না। মহারাজারা ছাড়াও এ-ব্যাপারে নগেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন ডালহৌসি ক্লাবের জে সাদারল্যাণ্ড এবং স্যার অ্যালেক্স এ আপকার। শীল্ড তৈরির অর্ডার দেওয়া হল বিলেতে। পরের কথা শুরুতেই বলেছি।

প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে খেলা চলেছিল দু' জায়গায়—কলকাতায় আর লখনউতে। ঠিক হল কলকাতা জোনের বিজয়ী আর লখনউ 'আপ-কান্‌ট্রি' জোনের বিজয়ীর মধ্যে ফাইনাল খেলা হবে। ফাইনালে 'আপ-কান্‌ট্রি' জোনের বিজয়ী রয়াল আইরিশ রাইফেলস কলকাতা জোনের বিজয়ী ফিফথ্ ওয়েস্টার্ন ডিভিশন রয়্যাল আর্টিলারিকে হারিয়ে (০-০, ১-০) শীল্ড নিয়ে গেল।

সেবারের প্রতিযোগিতায় একমাত্র ভারতীয় দল ছিল শোভাবাজার ক্লাব। শোভাবাজার দ্বিতীয় রাউণ্ডে। প্রতিদ্বন্দ্বী ওই ফিফথ ওয়েস্টার্ন ডিভিশন রয়াল আর্টিলারি, যারা পরে রানার্স আপ হল। খেলা দেখার জন্যে ডালহৌসি মাঠে গোটা কলকাতা ভেঙে পড়েছিল। শোভাবাজার কি পারবে আগের বছরের মতো সাহেব-দলগুলোকে হারিয়ে ওই ঝকমকে শীল্ডটায় নাম তুলতে? শোভাবাজারের হয়ে সেদিন নামলেন কালীচরণ মিত্র, মতিলাল শীল, মণি দাস (সকলেই ব্যাক)। ফরোয়ার্ডে ছিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদের ষষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়প্রসাদ, ডি দাস, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ('বড়বাবু')। আর একজন ছিলেন—অমৃত পাল। বাকি তিনজনের নাম পাওয়া যায় না। কালী মিত্র

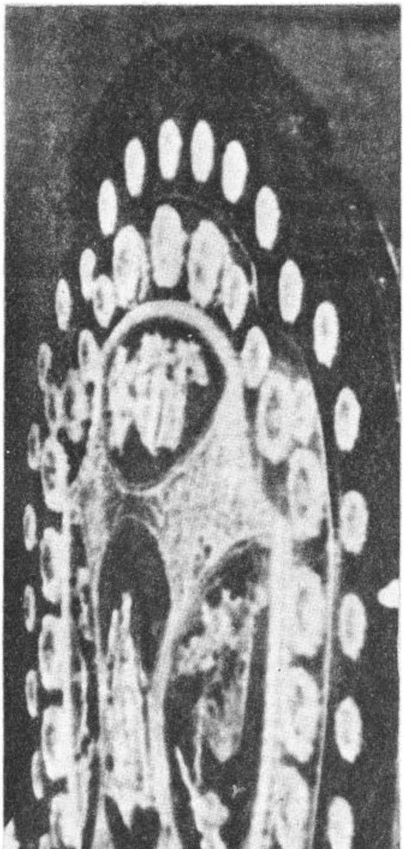

সে-যুগের খুব নামকরা ব্যাক ছিলেন। কোনও স্থানীয় দল যদি মিলিটারি দলগুলোর বিরুদ্ধে খারাপ খেলত, লোকে ব্যঙ্গ করে বলত, "কালীবাবু চিংড়িমাছ খেয়েছে!" কথাটা বহুদিন পর্যন্ত চালু ছিল ময়দানে।

না, সে-খেলায় জেতেনি শোভাবাজার। তিন গোলে হেরে গিয়েছিল। তবে ভারতীয় ফুটবলের সেদিনের হামাগুড়ির মূল্য ছিল অপরিসীম। দাঁড়াতে পারল উনিশ বছর পরে। নামটাই যা আলাদা। মোহনবাগান।

ব্রাজিলে ফুটবল

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ফুটবলকে ঘিরে ব্রাজিলবাসীদের যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তা বোধহয় অন্য সব দেশকে হার মানায়। সাও পাওলো ও রিও-ডি-জেনেরোর রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই চোখে পড়বে সকাল থেকেই ফাঁকা জমিতে ছোট-ছোট ছেলেরা বল নিয়ে খেলছে। তবে কলকাতার অলিগলিতে যেমন ফুটবল খেলার চল আছে, ওখানে তেমন নেই। ছেলেরা মাঠেই খেলে, তা সে যত ছোট মাঠই হোক না কেন। ব্রাজিলে ফুটবলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমুদ্রপাড়ে ফুটবল। কাজের শেষে সন্ধেবেলায় স্যাণ্টোস ক্লাবের অদূরে পরচার্ট ক্লাবের পাশে এই ধরনের ফুটবল খেলা দেখার সুযোগ হয়েছে আমার।

সাও পাওলো শহরের উপকণ্ঠেই সাণ্টোস ক্লাব। সাণ্টোস ক্লাবের নাম এখন সবার জানা। কারণ, পেলে বরাবর খেলেছেন এই ক্লাবেই। অবশ্য খেলা ছেড়ে দেওয়ার মুখে তিনি কিছুদিন নিউইয়র্কের কসমস ক্লাবের জার্সিও গায়ে তুলেছিলেন। আর ওই কসমস ক্লাবের হয়েই মোহনবাগান ক্লাবের আমন্ত্রণে পেলে খেলে

এই ছোট্ট শিশুটিও সাও পাওলো দলের মস্ত সমর্থক

গিয়েছেন কলকাতার ইডেন উদ্যানে। পেলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই পেলের অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যাণ্টোস ক্লাবের ১০ নম্বর জার্সিও চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে।

ষাট দশকে স্যাণ্টোস ক্লাব সাও পাওলো লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোট আটবার। বিশ্বকাপেও পরপর দুবার বিশ্বখেতাব জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এক সময় স্যাণ্টোস ক্লাব থেকে জাতীয় দলে স্থান পেয়েছিলেন ছজন খেলোয়াড়।

স্যাণ্টোস ক্লাব সম্প্রতি কিছু তরুণ খেলোয়াড়কে বড় আসরে আসার সুযোগ করে দিচ্ছেন। পেলেবিহীন স্যাণ্টোস ক্লাব এখনও পর্যন্ত মাত্র একবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, ১৯৭৯ সালে। আর্থিক সঙ্গতির বিচারে স্যাণ্টোস এখন সাও পাওলোর অন্যান্য ক্লাব থেকে অনেক পিছিয়ে। তাই ক্লাবের কর্মকর্তারা নতুন মুখের সন্ধানে পুরনো দিনের খেলোয়াড়দের পাঠাচ্ছেন বিভিন্ন শহরে। উদ্দেশ্য, ছোট ছেলেদের তালিম দিয়ে পেশাদার ফুটবলে নিয়ে আসা।

ছোট-ছোট ছেলেরাই দেশের প্রকৃত ভবিষ্যৎ—কথাটি ব্রাজিল ফুটবলের ক্ষেত্রে খুব সত্যি। ব্রাজিলের ফুটবল বলতে সাধারণত বোঝায় সাও পাওলো ও রিও-ডি-জেনেরোর স্থানীয় লীগ, এবং জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। সাও পাওলোর যে পেশাদার ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় তাতে প্রথম ডিভিশনে অংশ নেয় কুড়িটি ক্লাব। পেশাদারের পাশাপাশি প্রত্যেক ক্লাবেই রয়েছে আরও তিনটি ফুটবল বিভাগ। জুনিয়র, জুভেনাইল ও অপেশাদার। ক্লাবগুলি ছোট-ছোট ছেলেদের কোচিংয়ের ব্যবস্থা করে। সাও পাওলো ক্লাবে বছরে ৫,০০০ ছেলেকে ফুটবল শিক্ষা দেওয়া হয়। পলমিরাস-এ শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২,০০০। করিন্থিয়ান্স বা স্যাণ্টোস ক্লাবেও প্রায় হাজারখানেক শিক্ষার্থী আছে। জুনিয়র বিভাগের বয়ঃসীমা ১৫/৯ বছর বয়স থেকেই ছেলেদের প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়। জুনিয়র বিভাগে যারা ভাল খেলে তাদের দলভুক্ত করা হয় জুভেনাইল বা অপেশাদার ফুটবল প্রতিযোগিতায়। এদের বয়স সাধারণত ১৫ থেকে ১৮-র মধ্যে। প্রতি বছরই প্রত্যেক ক্লাব নিজেদের তৈরি চার-পাঁচটি ছেলেকে পেশাদার দলে নিয়ে নেয়। এর পেছনে দুটি উদ্দেশ্য কাজ

করে। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক যে-হারে বাড়ছে তাতে ক্লাবগুলির পক্ষে প্রতি বছর একাধিক প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় দলে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেদের সঙ্গে চুক্তি করা থাকলে ক্লাবগুলি আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হয়। তাছাড়া, ব্রাজিলের সব ক্লাবই গর্ববোধ করে, যদি তাদের তৈরি কোনও খেলোয়াড় জাতীয় দলে স্থান পায়।

ব্রাজিলে অবশ্য ১৬ বছর বয়স না হলে কোনও ছেলেকে কাজে নিযুক্ত করা যায় না। তাই, চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেদের সঙ্গে চুক্তি আইনানুগ নয়, কিন্তু উভয় পক্ষই এই চুক্তির শর্ত মোটামুটিভাবে মেনে চলে। পেলে যখন পনেরো বছর বয়সে স্যান্টোস ক্লাবে খেলতে আসেন তখন ক্লাব-কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে এই ধরনের একটা চুক্তি করেছিলেন।

ব্রাজিল ফুটবলের সঙ্গে কলকাতা ফুটবলের মিল আছে অনেক। ক্লাবপ্রীতি ও সমর্থকদের গোলমাল তো আছেই। সে জন্যে পুলিশকে কুকুর নিয়ে খেলার মাঠে হাজির থাকতে হয়। ওখানকার কর্মকর্তারাও রেফারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন।

ব্রাজিলের জাতীয় ফুটবলের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি। প্রতিদ্বন্দ্বী দলদুটি হল সাও পাওলো ক্লাব ও বোটাফোগো। সাও পাওলো ক্লাবের ছ'জন খেলোয়াড় এখন ব্রাজিলের জাতীয় দলের খেলোয়াড়। প্রেস-বক্সে বসে দেখেছি, গ্যালারিতে দর্শকরা নিজেদের ক্লাব-পতাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আর যখনই দলের খেলোয়াড়রা বল নিয়ে বিপক্ষের গোলের দিকে এগিয়ে চলেছেন তখনই ক্লাব-সমর্থকরা তাঁদের উৎসাহিত করেছেন।

ব্রাজিলে উত্তেজিত দর্শকদের সামলাবার ব্যবস্থা আছে। গ্যালারি থেকে খেলার মাঠের দূরত্ব প্রায় ২০০ গজ (কলকাতায় মাত্র কয়েক গজ)। দর্শকরা মাঠে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে কুকুর নিয়ে তাদের তাড়া করে। অনেক সময় দর্শকদের কাছেও আগ্নেয়াস্ত্র থাকে, কিন্তু তাতে খুব একটা ঝামেলা হয় না। কারণ পুলিশের কাছেও আগ্নেয়াস্ত্র আছে। তাছাড়া রেফারী ও খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার জন্য মাঠের নীচে সুড়ঙ্গের ব্যবস্থা আছে।

সাও পাওলোর নতুন ফরোয়ার্ড কামাসুটি। জাতীয় দলেও এর জায়গা বাঁধা

ফুটবলে কে ছিলেন গোলের গোসাঁই ?
আপনারা কেউ কি তা জানেন মোশাই ?
খাওয়াতেন গোল যিনি, সেই খেলোয়াড়
কী খেতে বাসেন ভাল, জানা আছে কার ?
কোয়ালিটি যা বানায়, চুনী খান তা-ই,
পুষ্টিতে ঠাসা খাসা ঠাণ্ডা মালাই ।
মুখে দিলে গলে যায়
আহারে কি পুষ্টি !
Kwality
আইসক্রীম

সিডনি থেকে লীডস

মণীশ মৌলিক

একুশে জুলাই, লীডসে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্টের শেষদিনে ক্রিকেটানুরাগীরা ভেবেছিলেন, এ-টেস্টেও ইংল্যাণ্ড গো-হারান হারবে। ব্রিয়ারলির পরিচালনা বা বথামের মারাত্মকভাবে ফর্মে ফিরে আসা—কোনোটাই বোধহয় হিউজের হাত থেকে ইংল্যাণ্ডকে বাঁচাতে পারল না! জেতার জন্য দরকার তো মাত্র ১৩০ রান। হিউজের দলবলের কাছে অতি সহজ অঙ্কের 'লক্ষ্য'। আমরা যখন ইংল্যাণ্ডের পরাজয় সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত, তখন ক্রিকেটের দেবতা হয়তো হাসছিলেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ বোলিং করে (৮/৪৩) বব উইলিস ধস্ নামালেন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে। মাত্র ১১১ রানে অস্ট্রেলিয়া নুয়ে পড়ল উইলিসের বলের ঘায়ে। ফলোঅন করেও অবিশ্বাস্যভাবে আঠারো রানে জয়ী হল ইংল্যাণ্ড। সৃষ্টি হল ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা প্রমাণের আর এক নজির।

তবে এই নজির কিন্তু নতুন নয়। সাতাশি বছর আগে ফলোঅন করেও ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আর একবার বিজয়ী হয়েছিল। ১৮৯৪-৯৫ সালে সিডনিতে প্রথম টেস্ট ছিল ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৩৯তম মোলাকাত। অস্ট্রলিয়ার উইকেটরক্ষক অধিনায়ক জে এম ব্ল্যাকহ্যাম সে টেস্টে টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। ইংল্যাণ্ডের বোলিং-শক্তিকে চূর্ণ করে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৫৮৬ রান করেছিল। সেঞ্চুরি (১৬১) করেছিলেন জি গিফেন এবং ডাবল সেঞ্চুরি (২০১) হাঁকিয়েছিলেন এস ই গ্রেগরি। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ওটাই প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি। প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ড দল ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে সাকুল্যে সংগ্রহ করল ৩২৫ রান। এ ওয়ার্ড করলেন ৭৫। ডব্লু ব্রকওয়েল (৪৯) ও জে ব্রিগস (৫৭) ছাড়া আর

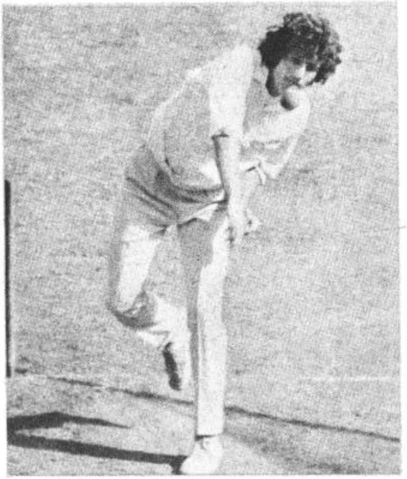

বব উইলিস

কেউই চল্লিশের ঘরে পৌঁছতে পারলেন না। অর্থাৎ ২৬১ রানে পিছিয়ে থেকে আবার ব্যাট করতে নামতে হল ইংল্যাণ্ডকে। দ্বিতীয় দফায় অনেক ভাল খেলে ইংল্যাণ্ড ৪৩৭ রান সংগ্রহ করল। দ্বিতীয় ইনিংসে একটি চমৎকার সেঞ্চুরি (১১৭) করলেন প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ রানসংগ্রহকারী ওয়ার্ড।

১৭৭ রান করলেই জিত, এমন অবস্থায় দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামল অস্ট্রেলিয়া। হাতের কাছেই জয়। সেদিনও বোধহয় বিধাতা হেসেছিলেন। অস্ট্রেলিয়া দলকে দ্বিতীয় ইনিংসে ভেলকি দেখাতে লাগলেন ইংল্যাণ্ডের দুই বোলার—আর পীল ও জে ব্রিগস। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে গিফেন ও ডার্লিং একটা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। পীল-ব্রিগসের দাপটে তাও গেল ভেঙে। তারপর বাকি ব্যাটসম্যানেরা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার। কিন্তু জয় যখন আর সামান্য দূরে, তখনই দলের শেষ ব্যাটসম্যান টার্নার পীলের বলে তাঁরই হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন।

দশ রানে জয়ী হয়ে ফলো-অনের গ্লানি মুছে সেদিন প্যাভিলিয়নে ফিরেছিলেন অধিনায়ক স্টুডার্ট ও তাঁর দল। সাতাশি বছর পরে লীডসে ব্রিয়ারলিও একইভাবে তাঁর বাহিনী নিয়ে একটি সত্য আবার প্রমাণ করে তাঁবুতে ফিরেছিলেন। সেটি হল ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা।

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—

কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ। রেক্সোনা মেখে স্নান করুন— এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 BG

॥ ২৭ ॥

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুর রহমান কুয়ালালামপুরে ভারতীয় হাই কমিশনারের সামনেই আমার এমন প্রশংসা করেছিলেন, যাতে আনন্দের চেয়ে সংকোচই বেশি হচ্ছিল। বলেছিলেন, "আমার দেশে ভারতীয়ের সংখ্যা দশ লক্ষ, তার মধ্যে একজনও যদি পি কে ব্যানার্জি হত।" ঘড়ি এবং টিনের মেডেল উপহার দিলেন। টিনের মেডেল শুনে তোমরা হেসে ফেললে নাকি? হেসো না, কারণ আসল টিনের দাম রুপোর চেয়ে অনেক বেশি। টিন বলে বাজারে সাধারণত যা চলে এবং যা আমরা দেখি, সেটা আসলে পাতলা লোহার চাদর—তার ওপর অ্যালুমিনিয়ামের জল মাখানো।

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও দুঃখ হচ্ছিল নেভিলের জন্য। আগেই বলেছি, নেভিল ডিসুজার একটু নরম ধাতের খেলা বাঘাদার পছন্দ না হওয়ায় কেষ্ট পাল নিয়মিত খেলছিলেন। প্রচণ্ড লড়ার ক্ষমতা থাকায় কেষ্ট পাল টীমের পক্ষে অপরিহার্যও হয়ে উঠেছিলেন। তবু, নেভিলের দুঃখ তো যাবার নয়। আগের বারেই যে অলিম্পিকের আসর মাতিয়ে এসেছে, তার কি দিনের পর দিন মাঠের বাইরে বসে থাকতে ভাল লাগতে পারে?

আমরা, মানে ইস্টার্ন রেলের ফুটবলাররা, জানতাম যে, বাঘাদার দুটো 'বুক' আছে—'গুড বুক' আর 'ব্যাড বুক'। 'গুড বুকে' যার নাম উঠবে, তার সাত খুন মাপ। আর 'ব্যাড বুকে' যার নাম, হাজার চেষ্টা করেও সে 'গুড বুকে' আসতে পারবে না। এই 'গুড বুকে' আগে ছিলেন সাহু মেওয়ালাল, পরে ছিলাম আমি। 'ব্যাড বুকে' ছিলেন নিখিল নন্দী। নেভিলের দুর্ভাগ্য, তাঁর নামটাও ঐ 'ব্যাড বুক'টায় উঠে গিয়েছিল।

এই সফরের পর নেভিল আর কখনও ভারতের হয়ে খেলেননি। যে-মানুষটা কখনও কারো ক্ষতি করেননি, বন্ধুবেশে তাঁরই ঘনিষ্ঠ কেউ নাকি তাঁর সর্বনাশ করেছিলেন। এই সর্বনাশের সঙ্গে খেলার মাঠের কোনো সম্পর্ক ছিল না। প্রায় বছর তিনেক নেভিল অর্ধোন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন।

কুয়ালালামপুর থেকে আমরা গেলাম পেনাং। তিনশো মাইল রাস্তা দারুণ আরামদায়ক গাড়িতে অতিক্রম করার সময় অনেকেই ঘুমিয়ে পড়লেন। বলরাম, নারায়ণ আর আমি অবশ্য দু'চোখ খোলা রেখে রাস্তার দু'পাশের চমৎকার দৃশ্য দেখে গেলাম। রাস্তার পিচের সঙ্গে রাবার মেশানো, যাতে গাড়ির চাকা ভাল 'গ্রিপ' নিতে পারে।

পথে একটা বিরাট ক্রেন দেখে উৎসুক হলাম। চিনা ড্রাইভার বললেন, "ওখানে টিনের খনি। জানেন নিশ্চয়, এদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে দুটি জিনিসের ওপর—টিন আর রাবার।"

যেতে যেতেই দেখলাম লুঙ্গি-ব্লাউজপরা মেয়েরা রাবার সংগ্রহ করছে। অনেকটা খেজুরের রসের মতো ব্যাপার। তিন-চার ফুট উঁচুতে অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে।

পেনাং যাওয়ার পথে একটা মন্দির দেখার জন্য আমরা নামলাম। সন্ত্রস্ত হয়ে দেখলাম, মন্দিরের মধ্যে আঠারো থেকে কুড়ি ফুট লম্বা অন্তত তিরিশটা অজগর সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে! নিতান্তই নিরীহ পোষা সাপ শুনেও ভয়টা পুরোপুরি কাটল না। গাড়িতে যাঁরা ঘুমোচ্ছিলেন, তাদের ঘুমের আমেজ পুরোপুরি কেটে গেল!

কিছুক্ষণ পরেই, দূর থেকে দেখা গেল ঝাউগাছ আর বালির রেখা। বুঝলাম, পেনাং-এর সমুদ্রতীরে পৌঁছে গেছি। প্রথমে সার্কিট হাউসে খাওয়া-দাওয়া, তারপর আমাদের হোটেলে তোলা হল।

বাঘা সোম

পেনাং 'ফ্রী পোর্ট'। তখন ওখানে বিদেশী জিনিসপত্র হংকংয়ের চেয়েও শস্তা। সুতরাং প্রথম দিন থেকেই বাজার করার ধুম পড়ে গেল। কতরকম অভিজ্ঞতা যে হল। আমরা কেউই কাউকে বলতাম না, জিনিসটা ঠিক কত দাম দিয়ে কিনেছি। শুনে যদি কেউ বলে ফেলে যে, ঠকে গেছি! যে বোকা, সেই তো ঠকে।

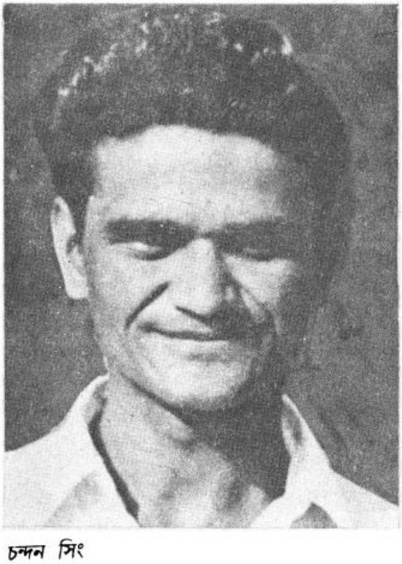

চন্দন সিং

আর বোকা হিসেবে পরিচিত হতে কেইবা চায়, বলো?

পেনাংয়ে প্রথম খেলা স্থানীয় চিনা ফুটবল দলের সঙ্গে। মোহনবাগানের সঙ্গে সফর করতে গিয়ে পারাপত হ্রদে স্নান করে বিপদে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা আসলে তেমন শিক্ষা আমাকে দেয়নি। নাহলে, সকালে সকলে মিলে মনের সুখে সমুদ্রস্নান করতে যাব কেন?

দারুণভাবে খেলা শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ২—১ গোলে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু হাফটাইমের আগেই সকলে নেতিয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়ার্ধে একতরফা খেলে চিনা দল ৩—২ গোলে জিতে গেল। এই ম্যাচে আমার একটা গোলের কথা বারবার মনে পড়ে। বাঁ দিক থেকে বল এসে পড়েছিল পেনালটি বক্সের মাথায়। ডান দিকে ছুটে এসে প্রচণ্ড শট নিলাম। গোলকীপারের গায়ে লেগে বল গোলে ঢুকল। আর গোলকীপার অজ্ঞান! বাঘাদা সচরাচর হাসতেন না। কিন্তু গায়ে শট লেগে গোলকীপারের অজ্ঞান হওয়ার ঘটনাটার উল্লেখ করে খেলার পর বাঘাদা হেসেই চললেন।

পরের খেলা সম্মিলিত পেনাং একাদশের বিরুদ্ধে। চিনা দলের চেয়ে এই টীম অনেক শক্তিশালী, তবু এই ম্যাচে আমরা সহজেই ৩—১ গোলে জিতলাম।

জোহারবাহরুতে পরের ম্যাচেও জিততে কোনও অসুবিধা হল না।

এরপর সিঙ্গাপুরে ফিরে সিঙ্গাপুর একাদশের বিরুদ্ধে আবার খেলা। টীমের অনেকেরই শরীর খারাপ। নানারকম খাওয়া-দাওয়া সহ্য হচ্ছিল না। হাফটাইমের সময় আমরা দুই গোলে পিছিয়ে। আমাদের হয়ে, বলতে গেলে, একলা লড়ছিলেন চন্দন সিং। চন্দন সিং সেদিন মাঝমাঠ থেকে যে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছিলেন, তখনকার দিনে তেমন দেখাই যেত না। আজকের চার-তিন-তিন প্রথায় চন্দন সিংয়ের মতো একজন মিডফীল্ডার রাজার সম্মান পেতে পারতেন।

যাই হোক, হাফটাইমে নেভিল বাঘাদাকে বললেন, "আমরা তো দু'গোলে হারছিই, আমাকে একটা সুযোগ দিন। কে পাল ভাল খেলছে, কিন্তু বদ্রু (এস ব্যানার্জি) অসুস্থ। ওর জায়গায় আমাকে রাইট ইনসাইড হিসেবেই না

হয় খেলান। কথা দিচ্ছি, গোল দিতে না-পারলেও গোল করাব।"

বাঘাদা চট করে রাজি হয়ে গেলেন। তোমরা জেনে অবাক হবে, নেভিল অক্ষরে-অক্ষরে কথা রাখলেন। দুটো বল একেবারে সাজিয়ে দিলেন, আমি কোনো ক্ষেত্রেই গোলে বল পাঠাতে ভুল করলাম না। খেলা ২—২। এবং তারপর নিজেই তৃতীয় গোল করে নেভিল আমাদের জিতিয়ে দিলেন।

খবর এল, হংকংয়ের কর্তারা চান, ফেরার পথে আমরা যেন আরও একটা ম্যাচ খেলে যাই। কিছুটা চ্যালেঞ্জেরও ব্যাপার ছিল। আমরা সবাই তখন খুব ক্লান্ত, তবু রাজি হয়ে গেলাম। চ্যালেঞ্জ বলে কথা! তাছাড়া, মনের কোণে কি শস্তায় আরও কিছু বিদেশী জিনিস কেনার ইচ্ছেও ছিল না?

সফরের এই শেষ ম্যাচে এক নতুন তারকার জন্ম হল। বদ্রুদা অসুস্থ। কানাইয়ানও ঠিক ফর্মে ছিলেন না। আজিজ এবং নুর বললেন, "বলরাম খেলুক।"

আমার পাশে রাইট ইনসাইড হিসেবে খেললেন বলরাম। একের পর এক নিখুঁত বল বাড়ালেন। এক ম্যাচেই যেন পরিণত আন্তর্জাতিক ফুটবলার হয়ে গেলেন বলরাম। ঐ নিরীহ ফুটবলারটির মধ্যে যে কী প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে, তা সকলকেই বুঝতে হল। এরপর থেকে আর তাঁকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ভারতীয় আক্রমণের 'মস্তিষ্ক' হিসেবে তাঁর জায়গা পাকা হয়ে গেল।

বলরাম ছাড়াও অনবদ্য ফুটবল খেললেন নুর। ৩—২ গোলে আমরা এগিয়ে, খেলা শেষ হতে কয়েক মিনিট বাকি। হংকং একাদশের আট-নয়জন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন গোল শোধ দেবার জন্য। অন্যদের পাশে নিয়ে সব আক্রমণ রুখে যাচ্ছিলেন নুর। একবার জটলা থেকে ওদের একজন ফরোয়ার্ড দারুণ শট নিলেন, নুর গোল লাইন থেকে হেড করে ফিরিয়ে দিলেন। আবার শট; কিন্তু আবার হেড করতে গিয়ে নুর লক্ষ করলেন সামনেই হংকংয়ের তিনজন ফরোয়ার্ড, কারো পায়ে বল পড়লেই নির্ঘাত গোল। লাফিয়ে উঠে, সামনে হেড না করে নিখুঁতভাবে নুর সেই বলটি ফেললেন জালের ওপর— ফ্যাগ কিক। আমরা বেঁচে গেলাম।

(ক্রমশ)

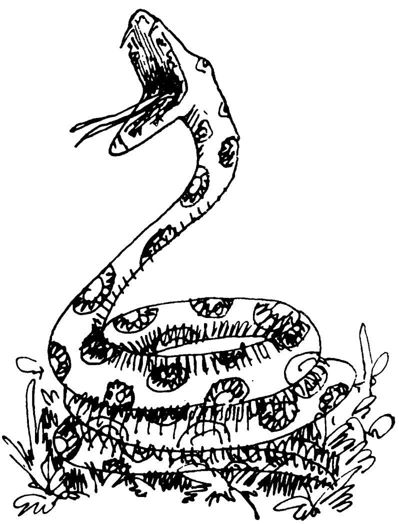

তেমাথা

রেবন্ত গোস্বামী

(১)

গতকাল হরি পাল বাসে এক চড়িয়া
হাওড়ায় যাচ্ছিল। যেতে হবে ঝরিয়া।
বসেই সে ঢুলল
চোখ যবে খুলল
দেখে হায়, জায়গাটা হাওড়া না—গড়িয়া।

(২)

কেউটে ঠাকুমা বলে, শোন্ বেজি নাতনি,
খেয়ে যা রে ওল দিয়ে তেঁতুলের চাটনি।
কুমড়োটা দায়ে কেটে
আদা কাঁচকলা বেটে
তেলে-জলে রাঁধতে যে হল বেশ খাটনি।

(৩)

শিকারেতে গেল কাল ও পাড়ার হলধর
সকাল হলেও সে তো ফিরল না তার ঘর।
খোঁজে তার গিয়ে দেখি
টুপি তার পড়ে এ কী!
পাশেতে ঢেঁকুর তোলে পেটমোটা অজগর।

ছবি রতন সেন

জন্মদিনের উপহার
আনন্দ তার বোন শীলাকে নিয়ে মেলায় এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে দেখে এক বেদে কুকুরছানা বিক্রি করছে।
-ইস, কি মিষ্টি আমি এটা কিনবো।
-মাত্র ১০০ টাকা।
ওরা ভেঙ্গে পড়লো।
-আমাদের যে মাত্র ৫ টাকা আছে চলো শীলা- কাঁদেনা। দেখো, এবারে তোমার জন্মদিনে আমি তোমায় একটা কুকুরছানা দেবই দেবো।
ঐ দিনই আনন্দ তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো-
-বাবা, শীলার জন্মদিনে উপহারের জন্যে আমি কিছু জমাতে চাই, কি ভাবে জমাই বলো তো!
-খুব সোজা। রোজ একটু করে জমাও। আমি ইউকোব্যাঙ্কে তোমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেবো।
-ইউকোব্যাঙ্ক! আমি যা জমাবো, তা কি ওরা নেবে, সে তো খুবই কম।
-নিশ্চয়ই নেবে। নিয়মিত জমিয়ে যাও, বছরের শেষে দেখবে অনেক জমেছে।
United Commercial Bank
সেদিন থেকেই আনন্দ জমাতে শুরু করল।
শীলার জন্মদিনের ঠিক আগে আনন্দ তার পাশবই বাবাকে দেখায়।
-বাবা, ব্যাঙ্কে আমার ১৫০ টাকা জমেছে। এইবারে নিশ্চয়ই শীলাকে কুকুরছানা কিনে দিতে পারবো।
-চমৎকার!
জন্মদিনের সকাল
-আনন্দকে ধন্যবাদ দাও। তোমাকে এই কুকুরছানা কিনে দেবার জন্যে সে তার হাত খরচ থেকে এটাকা জমিয়েছে।
-শীলার আজ ভারী আনন্দ কিন্তু সেটা তো ইউকোব্যাঙ্কের জন্যেই
ভৌ! ভৌ!
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান
UCO/CAS-77/80-BEN

সুন্দরবনের হারুদা

স্নেহময় সিংহরায়

হারুদা ছিল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। খুব দুরন্ত আর খেয়ালি। এমন কাজ নেই যা সে পারত না। তার গল্প বলি।

মাঝেমধ্যে আমি আমার মামার বাড়ি সুন্দরবনে বেড়াতে যেতাম। মায়ের পিসতুতো দাদা গগনবাবু আমার মামা। তিনি প্রতি বছর পুজোর সময় কলকাতায় এসে আমাকে বলে যেতেন, "সোনা, বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেলে আমাদের ওখানে বেড়াতে যাস।"

মামার দু ছেলে। তাপস আর তপন। তাপসদা কলকাতায় থেকে বি.এসসি পড়তেন। তপন আমারই বয়সী। গ্রামের আতাপুর হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সেবার অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়ে ঠিক করলাম সুন্দরবনে মামার বাড়িতেই বেড়াতে যাব। ওখানে গিয়েই আলাপ হল হারুদার সঙ্গে। মামা কাজ করতেন গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায়। তিনি ছিলেন নায়েব। জমিদারবাবুর ভাগ্নে প্রাণতোষবাবুর বড় ছেলে হারুদা। মামাদের গ্রাম আতাপুরের পাশ দিয়েই বিদ্যাধরী নদী বয়ে চলেছে। এই নদীর পাশেই আতাপুর হাই স্কুল। একদিন বিকেলে আমি আর তপন দুজনে স্কুলের কাছে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নোনা জলের নদী বিদ্যাধরী নদীর দুপাশে জঙ্গল। বনখেজুর, হেঁতাল, কেওড়া, সুন্দরী ও বান গাছের জঙ্গলে দু'পারই ভর্তি।

স্থানীয় লোকেরা এ-অঞ্চলকে বলে আবাদ অঞ্চল। এখন পোষ মাসের শেষ। চারিদিকে ধানকাটা হয়ে গেছে। মাঠগুলো ফাঁকা-ফাঁকা। চাষিরা মাঠ থেকে ধান সব মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ দেখি একটি লাল রঙের ঘোড়ায় চড়ে আমাদের চেয়ে একটু বড় বয়সের একটি ছেলে দৌড়ে আমাদের দিকেই আসছে। এসে সে ঘোড়া থামিয়ে আমাদের কাছেই দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "কী রে তপু, কেমন আছিস, তোর সঙ্গে ওটা কে রে?"

তপন উত্তরে বলল, "এর নাম সুব্রত, এ কলকাতায় থাকে, আমার পিসির ছেলে।"

হারুদা বলল, "কাল সকালে আমাদের ওখানে যাস না বেড়াতে, সুব্রতকেও নিয়ে যাস।"

হারুদারা থাকত পুরনো জমিদারি কাছারি বাড়ির পাশে একটি বাংলো ধরনের বড় বাড়িতে। হারুদার বাবা ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। কত লোক সকাল থেকেই তাঁর কাছে যাতায়াত করত। মামার বাড়ি থেকে দশ-বারো মিনিটের রাস্তা হারুদাদের বাংলো-বাড়ি। আমরা সকাল নটা নাগাদ গিয়ে হাজির। যাওয়া মাত্রই হারুদা বলল, "আয় আয়, বোস। বোস তপু, বোস সুব্রত।" দেখলাম হারুদাদের রাঁধুনি মন্মথ স্টোভে ডিমসেদ্ধ চাপিয়েছে। আর একটি উনুনে জল গরম হচ্ছে। চা হবে। হারুদা পোশাক-পরিচ্ছদ পরে তৈরি ছিল। হারুদার ছিল লম্বা-চওড়া শরীর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নিটোল স্বাস্থ্য। দারুণ টগবগে চেহারা।

একটু পরেই আমাদের জন্য ডিমসেদ্ধ, বিস্কুট ও চা এসে গেল। চা খাবার পরই হারুদা বলল, "তপু, চল্ যাই শিকার করে আসি। আমি আমাদের দোনলা বন্দুক নেব। আমাদের কালো ঘোড়া দুরন্তর পিঠে থাকব আমি, তুই আর সুব্রত থাকবি আমাদের লাল ঘোড়া লালির পিঠে।"

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "হারুদা, আমি তো ঘোড়ায় কোনোদিন চড়িনি।"

"সে হবে 'খন," বললে তপু, "আমি চড়ব, তুই আমার কোমর ধরে পিছনে বসবি।"

হারুদা বললে, "আমরা যাব ঝিঙেবাদের জঙ্গলে। এগারোটা নাগাদ পৌঁছে যাব। শিকার করব শামুকখোল আর পানকৌড়ি। সেদিন দেখে এসেছি একঝাঁক বক। বকের মাংস একটু শক্ত। কিন্তু পারলে তাদেরও মারব। শিকার করতে পারলে আজ রাত্রে এখানে তোদের নেমন্তন্ন। চল বেরিয়ে পড়ি।"

পালপুর, চৌধুরী-গাঁ, বেলতলি গ্রাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে পার হয়ে যাচ্ছি। শীতের সকাল। শোঁ-শোঁ করে দুপাশ দিয়ে হাওয়া বইছে। শিরশির করে ঠাণ্ডা লাগছে মাথায় হাতে পায়ে। কিন্তু মনটা খুব খুশিতে ভরে আছে। আমি শহরের ছেলে। এর আগে কখনো ঘোড়ায় চড়িনি। তার সঙ্গে শিকারের নতুন রোমাঞ্চ মিশে গিয়ে আমাকে খুব চঞ্চল করে তুলেছে। এমন সময় দেখি হারুদা অনেক আগে ছুটে চলেছে। আমরা কিছুটা পেছিয়ে পড়েছি। তপুকে বললাম, "তপু, জোরে ঘোড়া ছোটাও।" বললাম বটে, আমার কিন্তু ভয়-ভয় করতে লাগল, যদি হঠাৎ ছিটকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই। তপু লালিকে জোরে দৌড় করাতে শুরু করল। লালি জোর কদমে দৌড়তে লাগল। না, তেমন কিছুই হল না। আমার ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল।

দূর থেকে জঙ্গলের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এবারে দেখলাম, আমরা জঙ্গলের কাছে এসে পৌঁছে গেছি। বিদ্যাধরী নদীর এদিকটায় মাঝখানে এক জায়গায় চড়া পড়ে গেছে। এখন ভাটার সময়। দেখলাম, চড়ার ওপরে অনেক পাখি বসে আছে। কতকগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। নদীর ধার থেকে কী সব খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। ওপারেই ঘন জঙ্গল। তপু বললে, "এই হচ্ছে ঝিঙেবাদের জঙ্গল।"

হারুদা চড়ার ওপর দুম দুম করে ফায়ার করতেই কয়েকটা পাখি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। ঘোড়া থেকে নেমেই হারুদা চড়ার দিকে ছুটতে লাগল। জোরে দৌড়ে গিয়ে পাখি কুড়োতে লাগল। পাখি নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এপারে আসতে লাগল। দেখি, তার হাতে একটা বড় শামুকখোল আর তিনটে পানকৌড়ি। এই শামুকখোলটা ডানা ভেঙে পড়ে গেছিল। দেখি, সেটি এখনও বেঁচে আছে। হারুদা এসে বলল, "তপু, ধর এগুলো, বাঁধ এই দড়ি দিয়ে।" তপু পাখিগুলোর পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

তারপর হারুদা বলল, "চল, চড়াটা পার হয়ে ওপারে যাই। কাছেই দেখছিস জঙ্গলটা একটু ঘন হয়ে নদীর দিকে এগিয়ে এসেছে। অনেক সময় পাখিরা ডালের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। চুপিসারে গিয়ে ফায়ার করলেই দু-চারটে পড়ে যেতে পারে। কথাবার্তা বলিস না, জামা-প্যান্ট গুটিয়ে নে। যদি দু-এক জায়গায় কাদায় আছাড় খাস, তাহলেও কাদা লাগবে না।" হারুদার কথামতো আমরা দুজনেই তৈরি হয়ে নিলাম। এর মধ্যে দুরন্ত আর লালি মনের আনন্দে ঘাস খেতে শুরু করেছে। আমরা পাখিগুলোকে একটা গাছের উঁচু ডালে ঝুলিয়ে রেখে ওপারে রওনা হলাম।

ওপারে গিয়েই হারুদা বললে, “চুপ চুপ, একদম কথা বলবি না। ডালপালার মধ্যে দেখছি সাদা-সাদা ডোরা-ডোরা দাগ, হরিণ বলেই মনে হচ্ছে।” একটু পরে হারুদা গুঁড়ি মেরে বন্দুকের নলটা কেবল উঁচুতে তুলে রেখে সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর বলল, “একটা হরিণ তার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ঘাস খাচ্ছে। হঠাৎ এদিকে এসে পড়েছে। ওদের ধরতেই হবে। আমি ফায়ার করছি। যদি লাফ দিয়ে এদিকে এসে পড়ে, ধরবি।”

হারুদা ফায়ার করল। সঙ্গে সঙ্গে বড়-বড় শিংওয়ালা হরিণটা দিল দারুণ এক লাফ। দিয়েই জঙ্গলের ভিতর দিকে ছুটল। এদিকে বাচ্চা হরিণটা ভয়ে ছিটকে এসে পড়ল নদীর পাড়ে। হারুদা বলল, “ছোট্, ছোট্, গিয়েই ধরবি।” আমরা দৌড়তে শুরু করলাম। তার পরই দেখি হারুদা লাফ দিয়ে নদীর পাড়ে পৌঁছে গেছে। আমরা তিনজনে তিনদিকে বেড় দিয়ে একটু পরেই হরিণের বাচ্চাটাকে ধরে ফেললাম। তখন আমাদের সে কী আনন্দ।

হারুদা হরিণ-ছানাটাকে দু হাতে ধরে রইল। তপুর হাতে দিল বন্দুকটা। এর পর আমরা নদীর চড়ার ওপর দিয়ে হেঁটে, খানিকটা জলে নেমে এপারে চলে এলাম। নদীতে তখন জোয়ার আসছে। হারুদা বললে, “চল চল, তাড়াতাড়ি পার হয়ে চল।”

আমরা এপারে এসে পৌঁছলাম। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পৌঁছলাম হারুদাদের বাংলোয়।

এসে পৌঁছতে হারুদার বাবা আর সব যারা ছিল তাদের সে কী আনন্দ! হরিণ-ছানাটাকে দেখে সবাই বেশ মজা পেয়ে গেল।

হারুদাদের বাড়ি সে-রাত্রে পাখির মাংসের ঝোল আর ভাত খেয়ে আমরা সবাই খুব খুশি হলাম। অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-চৈ করে কেটে গেল।

হরিণছানাটি অনেক দিন ছিল হারুদাদের বাড়ি। পরের শীতে বেড়াতে গিয়েছি। দেখি হারুদাদের বাড়ির সামনে এক শিরীষ গাছ। তার তলায় বাঁধা আছে। ঘাস খাচ্ছে। একটু বড় হয়েছে। গায়ের লম্বা-লম্বা দাগ, আর ফোঁটা-ফোঁটা চিহ্নগুলো সকালের রোদে জ্বলজ্বল করছে।

ছবি দেবাশিস দেব

ছবির মজা

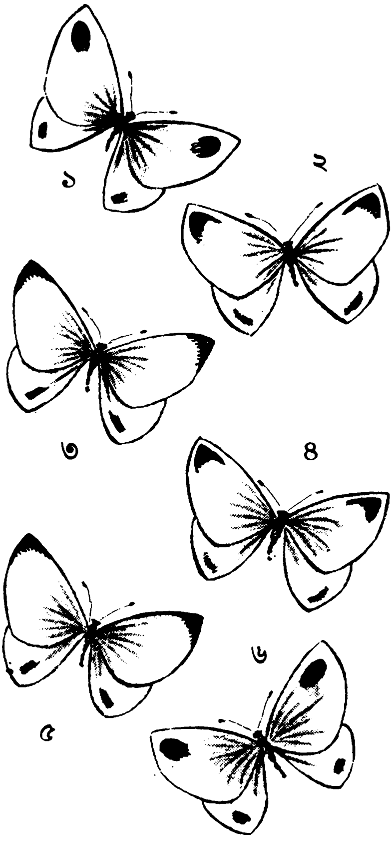

ছটা প্রজাপতির মধ্যে কার সঙ্গে কার হুবহু মিল আছে বলতে পারো?

(একের সঙ্গে ছয়ের, দুয়ের সঙ্গে চারের, আর তিনের সঙ্গে পাঁচের।)

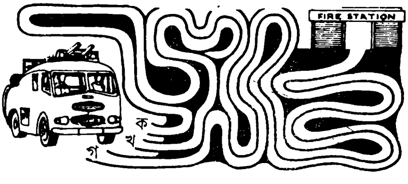

কোন্ পথ দিয়ে এগোলে দমকল ওই বাড়িতে পৌঁছবে বলতে পারো?

(ক-পথ দিয়ে এগোতে হবে।)

সুনির্মল বসুর

তিন-তিনটি

চিরনতুন বই

সুনির্মল বসু'র 'ছন্দের টুং টাং' পড়েছো? এ-বই পড়লে শিখতে পারবে কবিতা লেখা। খুব সহজ করে, সুন্দর করে, তোমাদের মতন করে সুনির্মল বসু শিখিয়েছেন, কী করে চোখে-দেখা আর কানে-শোনা চারপাশের সব-কিছুকে ধরা যায় মজাদার ছন্দে-মিলে। তেমনই আর-দুটি আশ্চর্য বই 'বঙ্কিমচন্দ্র' এবং 'মাইকেল মধুসূদন'। বঙ্কিমচন্দ্রের এবং মধুসূদনের ছোট্টবেলা থেকে শুরু করে জীবনের নানান কাহিনী। গল্পের মতো টুকরো-টুকরো সেই-সব কাহিনীর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের এই দুই দিকপাল লেখকের কর্মজীবন আর সাহিত্যজীবনের সঙ্গে খুব সহজেই পরিচয় হয়ে যায়।

নতুন বই

রণজিৎ কুমার রায়ের শিকার কাহিনী ৬·০০

সুনির্মল বসুর মাইকেল মধুসূদন ৬·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের হেতমগড়ের গুপ্তধন ৮·০০

বুদ্ধদেব গুহর গুগুনোগুম্বারের দেশে ১০·০০

আরো অনেক বই

অরূপরতন ভট্টাচার্যের কার কেমন আকার ৫·০০ সাধনা মুখোপাধ্যায়ের জানা-অজানা ৮·০০ আদিনাথ নাগের হিজঙ্গলের দেশে ৬·০০ প্রমদাচরণ সেনের ভীমের কপাল ৭·০০ কুন্তক-এর শব্দ নিয়ে খেলা ১০·০০ কার্তিক ঘোষের হিজিবিজির দেশে ৫·০০ মঞ্জিল সেনের ডাকাবুকো ৬·০০ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রুকুসুকু ৮·০০ আশা দেবীর আসল টেনিদা ১০·০০ অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর শাদা ঘোড়া ৮·০০ ইন্দ্রমিত্র-এর বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬·০০ শরৎ-কথামালা ১০·০০ মতি নন্দীর ননীদা নট আউট ৫·০০ সুবোধ ঘোষের সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৬·০০ লীলা মজুমদারের কাগ নয় ১০·০০ পাপু (সুব্রত সরকার)-র পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ১০·০০ পাপুর বই ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা: গবাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খান। গবার ঘরে মাঝরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। সার্কাসে যে-লোক মুখোশ পরে খেলা দেখায়, সে-ই কি হরিহর পাড়ুইয়ের খুনের মামলার ফেরারি আসামি গোবিন্দ মাস্টার? পরিচয় জানতে গোপনে তাঁবুতে ঢুকে দারোগা আক্রান্ত। কাকাতুয়া বলে, "রামু, পড়তে বোসো।" গবার মাধ্যমে ছদ্মবেশী গোবিন্দর সন্ধান পায় রামু। গোবিন্দর গোপন আশ্রয়ে কে আগুন লাগায়? সার্কাসের এককালের খেলোয়াড় সাতনা? গোবিন্দ বেঁচে যায়। গবা বলে, "খুন হবার সময় হরিহর বলেছিল, "পাখি সব জানে।" উদ্ধবের বাড়িতে ডাকাত পড়ে। কিন্তু বেহাত পাখি আবার উদ্ধবের কাছে ফিরে আসে।. নয়নকাজলকে ডাকাতরা হাত করেছে। তারপর....

॥ ২০ ॥

কাকাতুয়াকে লুচি খাইয়ে উদ্ধববাবু থানায় গেলেন। এতকাল এ-ব্যাপারে পুলিশকে জড়াননি তিনি। কিন্তু রাত্তিরে যা হয়ে গেল তাতে তিনি ভাবনায় পড়েছেন। ডাকাতদলকে ঠেকানো তো একার কাজ নয়।

উদ্ধববাবু উকিল হিসেবে খুবই ডাকসাইটে। সবাই তাঁকে খাতিরও করে। কুন্দকুসুমও করতেন। কিন্তু রাত্রির ঘটনার পর আজ যেন উদ্ধববাবুকে তিনি বিশেষ পাত্তা দিতে চাইছিলেন না। ঘটনাটা শুনে বরং হোঃ হোঃ করে খানিক হেসে বললেন, "একটা পাখির জন্য সাতটা ডাকাত কাল আপনার বাড়ি চড়াও হয়েছিল, এ-কথা নিতান্ত আহাম্মক ছাড়া কে বিশ্বাস করবে বলুন!"

উদ্ধববাবুও জানেন, পাখির জন্য ডাকাতি হয় এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তাঁর পাখিটা যে গুপ্তধনের সন্ধান জানে এ-কথাটাও তিনি ফাঁস করতে চান না। গলাখাঁকারি দিয়ে তিনি বললেন, "পাখিটা আসলে খুব দামি। রেয়ার টাইপের জিনিস।"

কুন্দকুসুম ভ্রূ কুঁচকে উদ্ধববাবুকে একটু দেখে নিয়ে ফিচেল হাসি হেসে বললেন, "একটা খুব রেয়ার পাখিরও দাম নিশ্চয়ই এত বেশি হতে পারে না যার জন্য বাড়িতে ডাকাত পড়বে। আপনি কি আমাকে ছেলেমানুষ পেলেন উদ্ধববাবু?"

কথাটা যুক্তিযুক্তই। কিন্তু কুন্দকুসুম তো আর গোপন কথাটা জানেন না। উদ্ধববাবু তাই মাথা চুলকে বললেন, "সে যাই হোক, আমার বড় ভয় করছে। আজ রাত থেকে আমার বাড়িতে দুজন আর্মড গার্ড যদি রাখেন তবে বড় ভাল হয়।"

কুন্দকুসুম মাথা নেড়ে বললেন, "অসম্ভব। আমার হাতে যে ফোর্স আছে তা নিতান্তই সামান্য। তার ওপর এই থানার সব জায়গায় রিসেন্টলি ক্রাইম ভীষণ বেড়ে গেছে। ইন ফ্যাক্ট একজন ফেরারি খুনি আসামির জন্য আমাকে সদর থেকে এক্সট্রা ফোর্স আনাতে হচ্ছে। আপনি যত বড় উকিলই হোন উদ্ধববাবু, এই অবস্থায় আপনার পোষা পাখিকে পাহারা দেওয়ার জন্য লোক দিতে পারব না। মাপ করবেন।"

উদ্ধববাবু মরিয়া হয়ে বললেন, "ডাকাত যে পড়েছিল তার কিন্তু সাক্ষী আছে। তারা দরকার হলে আদালতে বলবে যে, আপনি আমার বিপদ জেনেও প্রোটেকশন্ দেননি।"

"বটে!" বলে কুন্দকুসুম সোজা হয়ে বসে কটমট করে উদ্ধববাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি আমার বিরুদ্ধে আদালতেও যাবেন বলে ভাবছেন! কারা সাক্ষী আছে বলুন তো! আমি তাদের স্টেটমেণ্ট নেব।"

"গবা আছে, আমার ছোট ছেলে রামু আছে, জাফরচাচা আছেন।"

কুন্দকুসুম বাজখাঁই গলায় আবার হাঃ হাঃ করে হাসলেন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "রামু বা জাফরচাচা সাক্ষি দেবে না।

ওরা কিছু দেখেনি। বরং সাক্ষি দিলে ওরা উলটো কথাই বলবে। ওরা বলবে যে, আপনি বিপজ্জনক এক অস্ত্র নিয়ে বহু লোকের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন, বিকট চিৎকার করে লোকের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন।"

"ওরা দেখেনি!" চিন্তিত উদ্ধববাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "কিন্তু গবা তো দেখেছে।"

"গবাকে সাক্ষি দাঁড় করালে দেশসুদ্ধু লোকের কাছে আপনি হাস্যাস্পদ হবেন। কারণ সবাই জানে গবা বদ্ধ উন্মাদ। পাগলের সাক্ষি টেঁকে না, উকিল হয়ে এটা আপনার জানা উচিত ছিল।"

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলেন।

কুন্দকুসুম পিছন থেকে তিক্তমধুর গলায় বললেন, "সকালে আপনি রটিয়েছিলেন যে, আপনার পাখিটা চুরি গেছে বা ডাকাতি হয়েছে। কিন্তু আমি খবর রাখি যে, পাখিটা এখনো আপনার কাছেই আছে।"

উদ্ধববাবু কী একটা বলতে গেলেন, কিন্তু শেষ অবধি বললেন না। বলে লাভও নেই। এই মাথামোটা লোকটা তাঁকে বিশ্বাস করবে না। আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি থানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

পাখিটার জন্য আজ রাতে ডাকাতরা আর একবার হানা দিতে পারে। সুতরাং সন্ধের আগেই উদ্ধববাবু তৈরি হতে লাগলেন। তবে অসুবিধে দেখা দিল লোকজন জোটানোর বেলায়। জাফরচাচাকে বলতে গিয়েছিলেন উদ্ধববাবু, "চাচা, আজও আমার সঙ্গে রাতটা গল্পগুজব করে কাটাবেন নাকি?"

জাফর মিঞা আঁতকে উঠে বললেন, "কানে শোনার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছি ভাই, সেটা আবার হারাতে চাই না। তাছাড়া আজ বাতের ব্যথাটাও চাগাড় দিয়েছে।"

উদ্ধববাবু রামুকে ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু তার সাড়া পাওয়া গেল না। এমন-কী নয়নকাজলকে পর্যন্ত ডেকে গলা ভেঙে ফেললেন। "কোথায় যে সব থাকে!" বিরক্ত হয়ে এই কথা বলে সন্ধে-রাত্রিতেই উদ্ধববাবু বন্দুক কাঁধে নিয়ে বাড়ির চারদিকটা টহল দিলেন। টর্চ জ্বেলে বাড়ির সবচেয়ে দুর্বল অংশ কোন্‌টা এবং কোথা দিয়ে ডাকাতরা বাড়িতে ঢুকতে পারে তা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেন। বাড়িটা তাঁর খুবই মজবুত এবং নিরাপদ। কিন্তু তা বলে কি আর রন্ধ্র থাকতে পারে না! লখিন্দরের বাসরঘরেও তো রন্ধ্র ছিল।

ওদিকে তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও বাড়ির চারদিকে সার্চ করতে লেগে গেছে।

উদ্ধববাবু খিড়কির দরজাটা পেরেক দিয়ে একেবারে সেঁটে দিলেন, তারপর কয়েকটা পাথরের চাঁই এনে ঠেকা দিলেন তাতে। বাড়ির চারদিকে উঁচু পাঁচিলের ওপর উঠে কাঁটাতার বিছিয়ে দিলেন। আর সামনের বারান্দায় সরষের তেল ঢাললেন। অনেকগুলো কলার খোসা ছড়িয়ে রাখলেন। ডাকাতরা হুড়মুড় করে এলে যাতে আছাড় খায়। কেলেহাঁড়ি দিয়ে একটা কাকতাড়ুয়াও বানালেন। সেটাকে সামনের দরজার পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

সবই হল, কিন্তু নয়নকাজলের পাত্তা নেই। সে নাকি বিকেলের দিকে দোকানের সওদা করতে গেছে। এখনো ফেরেনি। রামু গেছে খেলার মাঠে। তারও কোনো পাত্তা নেই। উদ্ধববাবু বেশ উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত। কী করবেন ভেবে না পেয়ে তিনি স্টোর রুমে তালা দিয়ে রাখা পাখিটাকে দেখতে গেলেন।

তালা খুলে তাঁর চোখ কপালে উঠল। দাঁড় ফাঁকা। পাখির পালকটিরও পাত্তা নেই।

পাখি—রামু—নয়নকাজল! দুয়ে দুয়ে চার করতে উদ্ধববাবুর দেরি হল না। অবশ্য পাখির দাঁড়ে একটা চিরকুটও লটকানো ছিল। তাতে লেখা—"পাখিটা বিধিসম্মত মালিকের হস্তগত হইয়াছে। ব্যাপারটি লইয়া শোরগোল করিলে আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের প্রাণ সংশয় হইবে। জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী।"

কিন্তু তবু শোরগোল হল। পাড়া-প্রতিবেশীরা খবর পেয়ে ছুটে এল। কিন্তু তাতেও দেখা দিল প্রবল গণ্ডগোল। বারান্দায় আর উঠোনে ধপাধপ লোকজন আছাড় খাচ্ছে আর "বাবা রে, মা রে, গেছি রে" বলে চেঁচাচ্ছে। খুড়িখুড়ি চোখে কম দেখেন। তিনি সামনের দরজায় কাকতাড়ুয়াটাকে দেখে ভূত ভেবে সেই যে ভিরমি খেলেন আর চোখ খোলার নামটি নেই। সামনের বারান্দায় ভিড় হওয়ায় জনাকয় লোক পাঁচিলে উঠেছিল। কাঁটাতারে জামাকাপড় আটকে তাদের বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। রামুর মা আর ঠাকুমা ডুকরে কাঁদতে

লেগেছেন, রামুর ভাইবোনেরা কাঁদছে। এই গোলমালে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দায়। বারবার সবাইকে চুপ করতে বললেন উদ্ধববাবু। কে শোনে কার কথা! অবশেষে এই গোলমালে অসহ্য হয়ে উদ্ধববাবু বন্দুকটা আকাশে তাক করে দুম দুম করে দুটো ফায়ার করলেন। তাতে ফল হল উলটো। যারা কাঁদছিল তারা আরো জোরে কাঁদতে লাগল। পাড়াপড়শির বাচ্চারা ভয় খেয়ে চেঁচাতে লাগল। বন্দুকের শব্দে যারা চমকে উঠে পালাবার তাল করেছিল তারা ফের কলার খোসা আর তেল-হড়হড়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তবে উপকার হল একজনের। ভিরমি কেটে উঠে বসলেন খুন্তিখুড়ি।

কিছুক্ষণ বাদে লোকজন বিদেয় হল। কুন্দকুসুম তদন্তে এলেন। চারদিক ঘুরেটুরে দেখে বললেন, "আপনার বন্দুকের লাইসেনস আছে তো?"

"আছে।" উদ্ধববাবু বুক চিতিয়ে বললেন।

কুন্দকুসুমও বুক ফুলিয়ে বললেন, "থাকলেই কী! যখন-তখন ফায়ার করার আইন কিন্তু নেই। যাকগে, আপনার মন আজ অস্থির, বন্দুকের ব্যাপারে তাই কিছু বলছি না। আর রামুকে কিডন্যাপ, পাখিটা চুরি এবং নয়নকাজলের উধাও হওয়া—এগুলো আমার নোট করা রইল।"

কুন্দকুসুম চলে যাওয়ার পর বেশ একটু রাতের দিকে গবা পাগলা এসে ঘরে ঢুকল। তার মুখ থমথমে।

উদ্ধববাবু বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ভাবছেন। হাতে এখনো বন্দুক। ডাকাতরা শোরগোল করতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু শোরগোল কিছু বেশিই হয়ে গেছে। এখন রামুর কী হয় সেইটে নিয়েই তাঁর চিন্তা।

গবা ডাকল, "বাবু।"

"কী বলছিস?"

"একজন কাজের লোক রাখবেন? খুব ভাল লোক।"

এই দুঃসময়ে পাগলটা চাকর রাখার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে দেখে উদ্ধব অবাক হন। বলেন, "কী বলছিস?"

গবা তখন উদ্ধবের কানে-কানে চুপি-চুপি ক'টা কথা বলল। (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

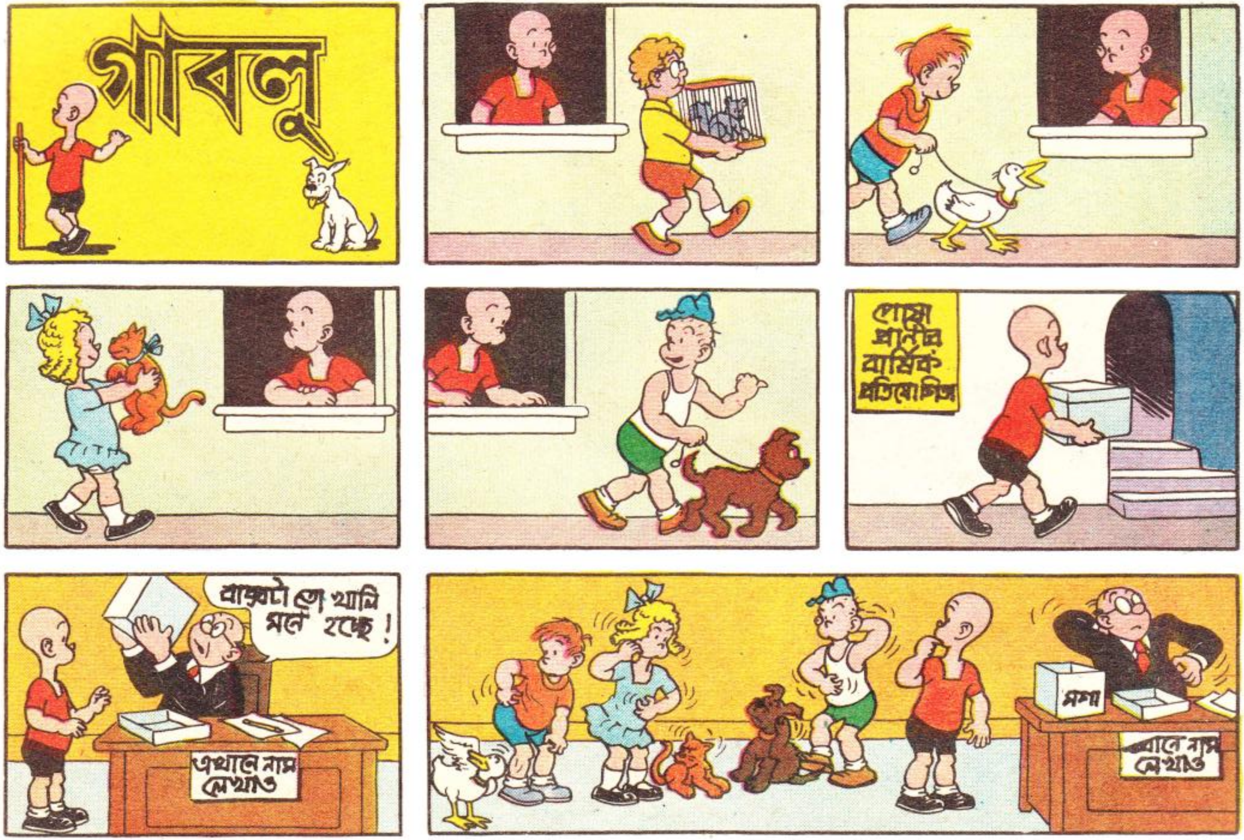
গাবলু
পোষা প্রাণীর বার্ষিক প্রতিযোগিতা
বাক্সটা তো খালি মনে হচ্ছে!
এখানে নাম লেখাও
মশা
খানে নাম লেখাও

স্বপ্নমঙ্গল

বাচস্পতি

খাতায় যা লেখা ছিল, তা দেখে ভণ্টু প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। দেখতে খানিকটা 'সরল' অঙ্কের মতো, কিন্তু সংখ্যার জায়গায় আছে কথা—কাজেই সব 'যোগ' হলেও আসলে খুব জটিল অঙ্ক যেন। খাতায় এই লেখা ছিল—

ই=[ঊর্ধ্ব,+সম্মুখ,+ছড়ানো]
উ=[ঊর্ধ্ব,+পশ্চাৎ,+গোল]
এ=[মধ্য,+সম্মুখ,+ছড়ানো]
ও=[মধ্য,+পশ্চাৎ,+গোল]
অ্যা=[নিম্ন,+সম্মুখ,+ছড়ানো]
অ=[নিম্ন,+পশ্চাৎ,+গোল]
আ=[নিম্ন+কেন্দ্রীয়]

রাত হয়ে এসেছে, খাতার দিকে তাকিয়ে ভণ্টুর খুব ঘুম পেতে লাগল। শেষে কোলে খাতা রেখে একসময় ঘুমিয়েই পড়ল সে। ঠাম্মা এসে কখন তুলে নিয়ে ঘুমের মধ্যে খাইয়ে দিলেন, কখন ঘুমের মধ্যে মশারির তলায় ঢুকে পড়ল, কিছুই ভণ্টুর খেয়াল নেই। ভাগ্যিস স্কুলের হোমটাস্কগুলো কাল করে রেখেছিল, তাই বাবা আর জাগিয়ে তুলে তাকে পড়তে বসাননি।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ 'হাউমাউ' করে চেঁচিয়ে উঠল ভণ্টু। বাবা-মা সকলে জেগে উঠলেন। বাবা কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে দিলেন তাকে, জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল রে? ভয়ের স্বপ্ন দেখেছিস কোনো? চিৎকার করলি কেন?" ভণ্টু খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানাল—না, ভয়টয় পায়নি। বাবা বললেন, "যা, জল খেয়ে এসে শুয়ে পড়!" ভণ্টু ছোট টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে জল খেয়ে এসে শুয়ে পড়ল, কিন্তু তক্ষুনি ঘুম এল না তার। একটু হাসিও পেতে লাগল ভেতরে ভেতরে। সে তো আর বাবাকে বলতে পারে না যে, সত্যি একটা ভয়ংকর বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছে সে। সে যেন একটা চড়াইপাখির মতো বিরাট একটা মানুষের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, আর একটা দৈত্যের মতো বিশাল জিভ তাকে তাড়া করেছে।জিভটার গোড়া আটকানো থাকলে কী হবে, বিরাট বিরাট ছোঁ মেরে সে ভণ্টুকে ধরবার চেষ্টা করছে—কখনো সামনে উঁচু হয়ে উঠে, কখনো পেছনে ঠেলে, কখনো আবার আগাটা উলটে। ভণ্টু মুখের দরজা দিয়ে যেই বেরুবার চেষ্টা করছে ততই ঠোঁট দুটোর সাইজ বদলে যাচ্ছে, আর সে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে বেরুতে পারছে না। আর আকাশ ফাটিয়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে আওয়াজ হচ্ছে 'ই-ই-ই', 'উ-উ-উ', 'আ-আ-আ'। এখন হাসি পাচ্ছে, কিন্তু তখন ভণ্টুর প্রাণ উড়ে যাবার অবস্থা। বাবাকে বললে বাবা নিশ্চয়ই বলবেন, "থাক, আর তোমার ভাষাবিজ্ঞানে কাজ নেই!"

তবে এই স্বপ্নে একটা জিনিস হঠাৎ ভণ্টুর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তা ঐ কথাগুলোর মানে। ভণ্টু বলতে পারল, যোগচিহ্ন দেওয়া প্রথম দুটো কথা আসলে জিভের 'পোজ' বোঝাচ্ছে, আর শেষ কথাটাতে বোঝাচ্ছে ঠোঁটের 'পোজ'। এক-একটা স্বরধ্বনিতে জিভ আর ঠোঁট মিলে ঐরকম অবস্থায় থাকে। পরের রোববার হিগিনকাকুকে কথাটা বলতেই তিনি পকেট থেকে একটা চকোলেট বের করে বললেন, "লহ এই পুরস্কার! তবে আরো কথা আছে।" (ক্রমশ)

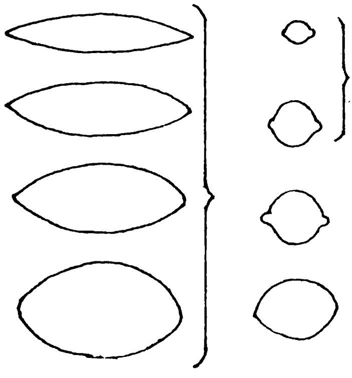

ঠোঁটের নানা পোজ—ছড়ানো, গোল

যত বৃষ্টি রবিবারে

প্রসাদ

যত বৃষ্টি কি রবিবারে? সেই যে সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে, এত বেলা হয়ে গেল, বৃষ্টির আর কামাই নেই। যত বেলা বাড়ছে বৃষ্টি যেন তত তেড়ে আসছে, ফুঁসে উঠছে। ছুটির দিনের সকালটা তো মাটি হয়েছে, বিকেলটাও বিলকুল বরবাদ হবার উপক্রম। কার মেজাজ এতে ঠিক থাকে বলো?

Chambal is getting angrier and angrier.
But he has nobody to blame for the weather.
That makes him angrier still.
Chameli, though younger, is wiser than her brother.
She knows it's no use fuming and fretting.
The rain will stop when it will, not a minute sooner.
She has just heard Mummy say so.
Mummy has been trying to make Chambal accept the situation.
Poor Chambal. You can't really blame him for growing more and more impatient as the rain shows no sign of stopping.
He and some of his friends had made such wonderful plans for today.
Babua, a boy of his class, has built a model aeroplane.
They were all to go and watch it fly near the race-course.
Chambal has a keen interest in aero-modelling.
He has dreams of becoming a pilot when he grows up.
He has no doubts that his dream will come true.

না, আজ আর কোনো আশা নেই। বাইবেলের সেই মহাপ্লাবনের বৃষ্টির মতো, এও মনে হচ্ছে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত চলবে। তা, নোয়ার মতো একটা নৌকো বানাতে পারলেও মজা হত, চম্বল মনে-মনে বলল। সামনের রাস্তা দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে।

Thinking of boats, Chambal suddenly has a brilliant idea.

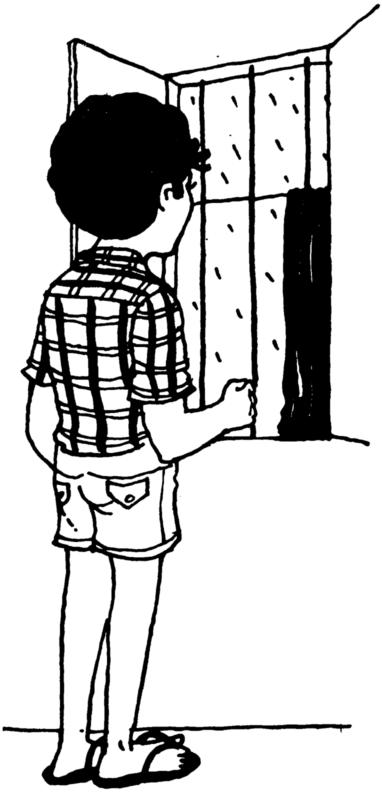

Why not try to make a boat?
Not one of those paper-boats that little children make, but a good strong one made of cardboard.
As Chambal is collecting material for his boat he happens to look out of the window.
The sky is turning a lighter grey.
But what's the good of that?
It's already much too late to think of carrying out their plans for the day.
Chambal turns to his boat-making again.

এবারে একটু লক্ষ করো:

Chambal *is getting* angrier.
He *is growing* more and more impatient.
He dreams of *becoming* a pilot some day.
His dreams *will come* true.
The sky *is turning* a lighter grey.

গাবলু
বিশাল ললিপপ দাম মাত্র ৫০ পয়সা
বিশাল ললিপপ দাম মাত্র ৫০ পয়সা
গোপন কায়দায় আপনার ললিপপকে আমরা ফুটোওয়ালা ডোনাট বানাই।
মাত্র তিন মিনিট এখানে ধরে রাখুন

বাঘা

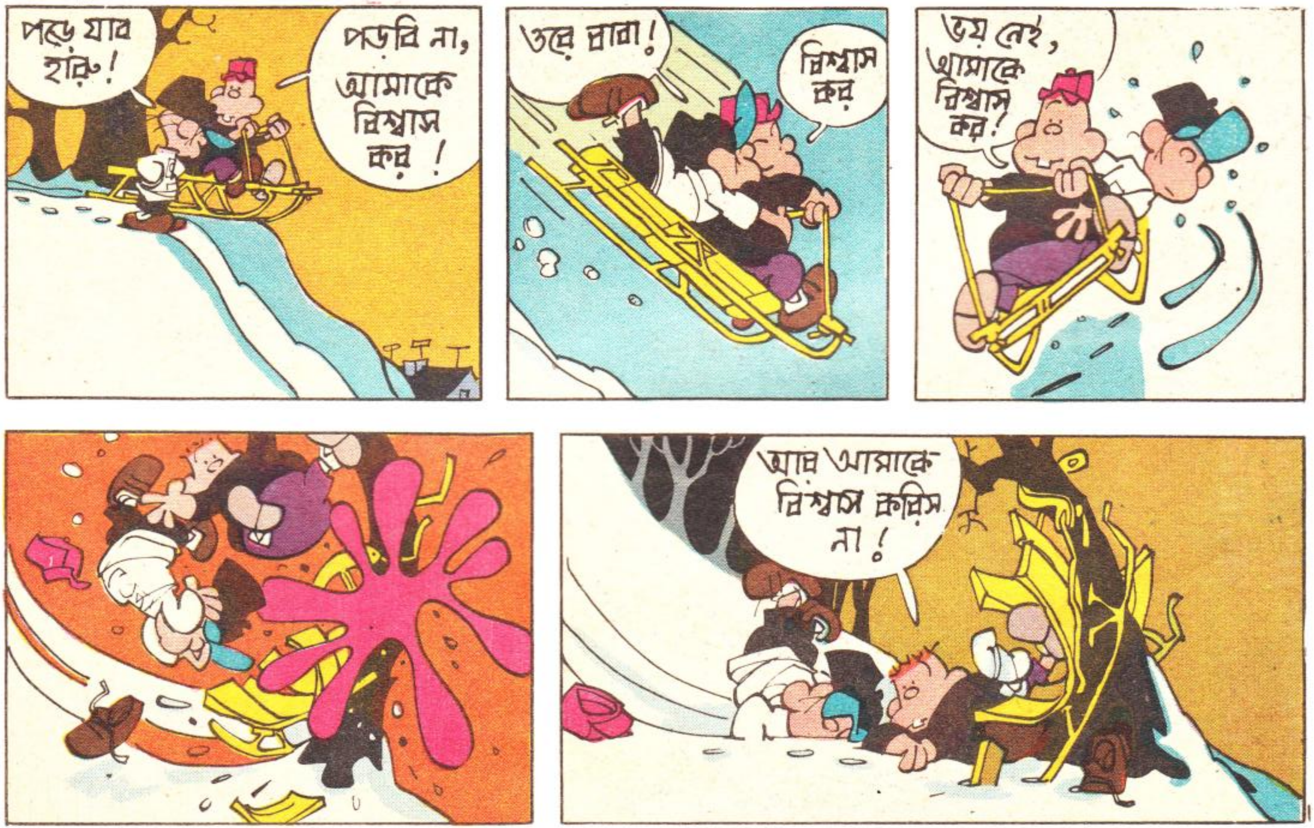

পড়ে যাব হাঁরু!
পড়বি না, আমাকে বিশ্বাস কর!
ওরে বাবা!
বিশ্বাস কর
ভয় নেই, আমাকে বিশ্বাস কর!
আর আমাকে বিশ্বাস করিস না!

আঁকো

ডিম থেকে পাখি

ডিম থেকে পাখি আঁকার মজায় একটু নজর দিলেই দেখবে নানান পাখির আকার, আর তা কেবল সম্ভব হচ্ছে ডিমের আকারের বাইরে আর ভেতরের আঁচড়ের ওপর।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

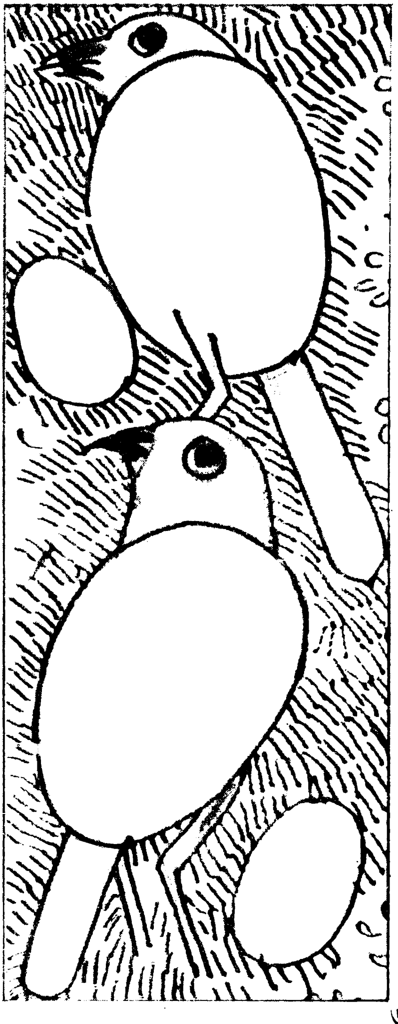

শেখো

কার্ডবোর্ডের কাজ : বাক্স—৫

সমান মাপের চৌকো বোর্ডকে সমান ষোল ভাগে ভাগ করো।

চার কোণের চার চৌকো 'গ' ছবির মতো কোনাকুনিভাবে চার ভাগে ভাগ করে নকশায় দেখানো কালো কোনাটিকে কেটে বাদ দিয়ে ৪ নং কোণটিকে ২ নং কোনার দাগ-বরাবর আঠা দিয়ে জুড়ে দিলেই ঢাল-দেওয়া বাক্স পাবে।

জেনে রাখো—(১) ৪ নং অংশটি ২ নং-এ জুড়লে একটু মাথার দিকে টুকরো উঁচু হয়ে থাকবে—তা কেটে বাদ দেবে। (২) এ কাজের মস্ত দিক হল সঠিক মাপ আর পরিচ্ছন্নতা।

—কারিগর

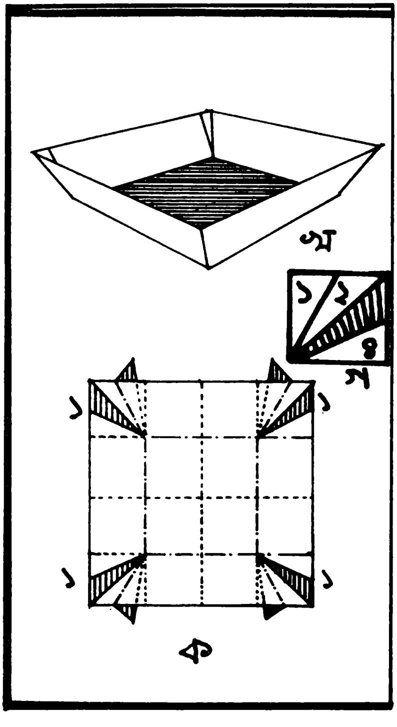

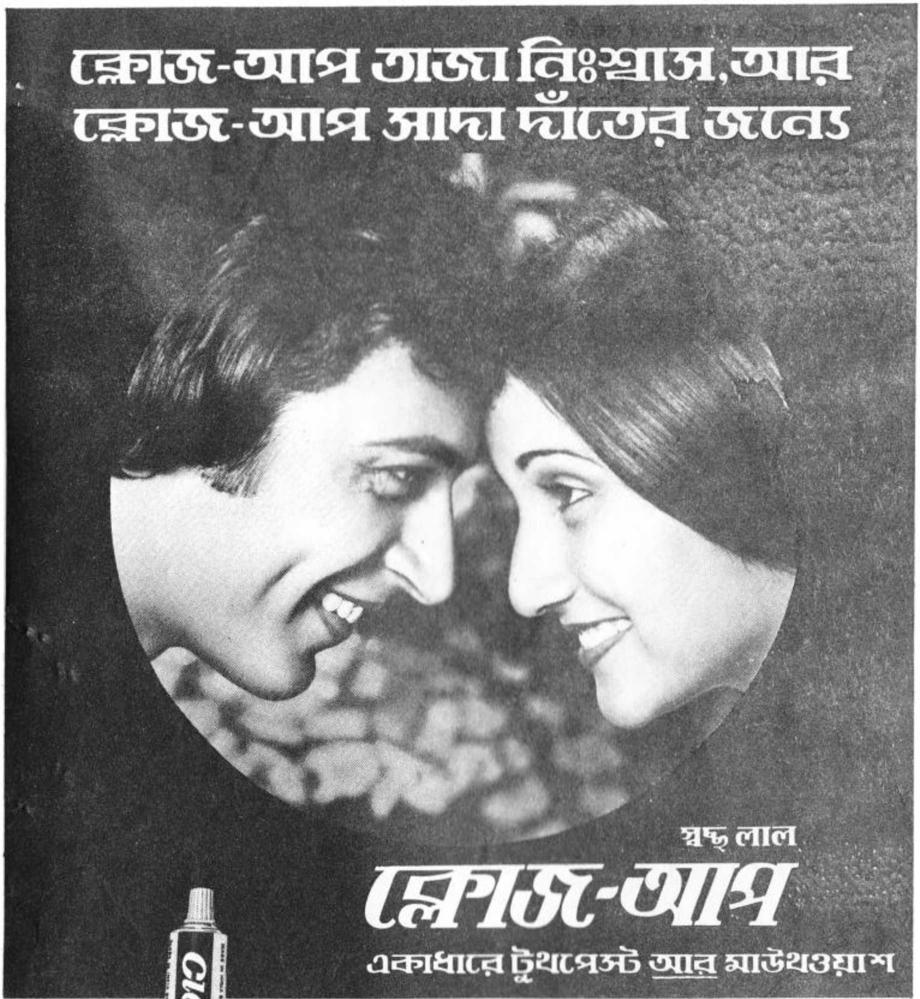

আপনি যখন সত্যিসত্যিই লোকের খুব কাছে থাকেন, আপনার চাই ক্লোজ-আপ—এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের টুথপেস্ট। এর আসল মাউথওয়াশ দিয়ে আপনার নিঃশ্বাস হয় ক্লোজ-আপ-তাজা, আর দুটি বিশেষ উপাদান দিয়ে আপনার দাঁত হয় ক্লোজ-আপ-সাদা!

কাছে, আরো কাছে পেতে—

ক্লোজ-আপ

হিন্দুস্থান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-CX. 35-1812 BG

প্রজাপতি প্রজাপতি দেখ লক্ষীটি.
আমার বাগান, ফুল আর আমি—তোমার পুরোন বন্ধুটি
প্রজাপতি প্রজাপতি জেম্‌স নাও এসে
তুমি আমি আর সব বন্ধু মিলে খাই ভালবেসে !
Cadbury
GEMS
পলে পলে জেম্‌স মুখে,
জীবন কাটে মহা সুখে!
ক্যাডবেরিস
চকলেটস্‌
ক্যাডবেরিস্‌ জেম্‌স থাকলে ভাই, বন্ধু পাওয়ার ভাবনা নাই।
OBM/6641/BN